ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শারীর স্থান লিখিত। Commentary on the Hindu System of medicine By T. A. wise M. D. New Issue, Landon 1860 Poge XVI. আমরা আজি সুশ্রুতের সেই সকল উপদেশেরই সারাংশ পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিব।

সুশ্রুতের চিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত—

১ম। শল্যতন্ত্র—ইহাতে কোনো কারণ বশতঃ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, ধূলি, লোহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, আঘাতাদি হেতু দেহগত ভগ্নাস্থি, দ্রব্যাদি হইতে পূযাদি এবং বিকৃত ভাবে গর্ভস্থ শিশু বহিষ্করণ জন্য যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

২য়। শালাক্য তন্ত্র—জত্রুদেশের অর্থাৎ কণ্ঠ ও হৃদয় সন্ধির উর্দ্ধগত কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকাদির স্থান জাত রোগ সমূহের বিবরণ ও তন্নিবারণোপায় এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৩য়। কায় চিকিৎসা—এই বিভাগে জ্বর, অতীসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার কুষ্ঠ, প্রমেহ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গগত রোগ সমূহের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ। ভূতবিদ্যা—এই প্রকরণে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, পিতৃ, সর্প প্রভৃতি গ্রহ কর্ত্তৃক বিকৃত চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বলি, হোম, উপবাসাদি শান্তি কর্ম্ম সমূহের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৫ম। কৌমারভৃত্য—শিশুপালন, ধাত্রীর স্তন্য সংশোধন, এবং দূষিত স্তন্য জনিত ও দুষ্ট গ্রহাবেশজনিত ব্যাধি সমূহ নিবারণের উপায় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ। অগদতন্ত্র—সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক, ইঁদুর প্রভৃতি সবিষ প্রাণিগণের দংশন জনিত বিষ নিবারণ এবং অন্যান্য বিবিধ স্থাবর ও জঙ্গম বিষ পান হেতু সঞ্জাত ব্যাধি সমূহ প্রতীকারের বিধান বিবৃত হইয়াছে।

৭ম। রসায়ন তন্ত্র—এই বিভাগে মানবগণের অধিক কাল চির যৌবন থাকিয়া সুস্থ শরীরে অজর ও নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

৮। বাজী করণ তন্ত্র। অল্প শুক্র বৃদ্ধি, দূষিত বীর্য্য সংশোধন বিশুষ্ক শুক্র সমুদ্ভাবন, ক্ষীণ শুক্র বর্দ্ধন, এবং স্ত্রী সংসর্গে শক্তি প্রাপ্তি বিষয়ক উপদেশ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত আটটি অঙ্গেরই উপদেশ সুশ্রুত সংহিতায় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইলেও শল্যতন্ত্রের উপদেশ যেরূপ সুন্দর ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে এখনকার উন্নত এ্যালোপাথিক শল্যতন্ত্রের নিকট কোনো অংশে কম নহে ইহা খুব জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে চরমোন্নতি লাভ করিলেও সুশ্রুতের যুগে ইহা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রণিধান পূর্ব্বক সুশ্রুতের শারীর স্থান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা মহর্ষি সুশ্রুতকে একজন পাকা সার্জ্জন না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

সুশ্রুত এ্যানাটমী বা শারীর স্থানের পরিচয়—প্রথমে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া বুঝাইতেছেন,—গর্ভাশয়স্থ অর্থাৎ জরায়ু কোষস্থ

আত্মা, অষ্টবিধ প্রকৃতি এবং পঞ্চ ভূতাদি ষোড়শ বিকার মিশ্রীকৃত যে শুক্র শোণিত তাহাই গর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গর্ভ—চেতনা দ্বারা অধিষ্ঠিত, বায়ু কর্ত্তৃক বিভাগীকৃত, তেজ দ্বারা পরিপাচিত, জল কর্ত্তৃক রস যুক্ত, পৃথিবী দ্বারা সংহত এবং আকাশ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া যখন হস্ত, পদ, জিহ্বা, নাসিকা,কর্ণ, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গ সমূহ প্রকাশ পাইয়া তদ্বারা সংযুক্ত হয়, তখন উহা শরীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শরীর—দুই হস্ত, দুই পদ, মধ্য ভাগ ও মস্তক—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। ইহারা আবার সাতটি ত্বক, সাতটি কলা, সাতটি আশয়, সাতটি ধাতু, সাত শত শিরা, পাঁচ শত পেশী, নয় শত স্নায়ু, তিন শত অস্থি, দুই শত দশটি সন্ধি, এক শত সাতটি মর্ম্ম, চব্বিশটি ধমনী, তিনটি দোষ, তিনটি মল এবং নয়টি স্রোতদ্বার দ্বারা আবৃত। ইহাদের পরিচয়ে ঋষি বলিয়াছেন,—প্রথমে যে ত্বক উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অবভাষিনী, এই ত্বক দ্বারা দেহের গৌরাদি সর্ব্ব বর্ণ অবভাষিত এবং পঞ্চ ভূতাত্মিকা ছায়া ও প্রভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ—একটি ধান্যের অষ্টাদশ ভাগের এক ভাগ। এই ত্বক—সিধ্ম (ছুলি রোগ) ও পদ্ম কণ্টক্ রোগ উৎপত্তির স্থান।

দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা। ইহার পরিমাণ ধান্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাতে তিল রোগ, ছুলি বিশেষ ও ব্যঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তৃতীয় ত্বকের নাম শ্বেতা। ইহার পরিমাণ ধান্যের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ। ইহা চর্ম্মদল, অজগল্লিকা ও মশক রোগ উৎপত্তির স্থান।

চতুর্থ ত্বকের নাম তাম্রা। ইহার পরিমাণ ধান্যের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাতে কিলাস ও কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চম ত্বকের নাম বেদিনী। ইহা ধান্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কুষ্ঠ ও বীসর্প রোগ এই ত্বকে জন্মিয়া থাকে।

ষষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিণী। ইহার পরিমাণ একটি ধান্যের ন্যায়। গ্রন্থি, অপচী অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ এই ত্বকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তম ত্বকের নাম মাংসধরা। ইহার পরিমাণ দুইটি ধান্যের অনুরূপ। ভগন্দর, বিদ্রধি ও অর্শোরোগ এই ত্বকে হইয়া থাকে।

**সপ্তম কলার পরিচয়।**—প্রথমা মাংস ধরা কলা। এই কলাধিষ্ঠিত স্নায়ু, ধমনী ও স্রোত সমূহের বিস্তারে মাংসে সিরা জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয়া কলার নাম রক্তধরা। এই কলাধিষ্ঠিত মাংসের মধ্যে, বিশেষতঃ যকৃত ও প্লীহাতে রক্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। তৃতীয়া কলার নাম মেদোধরা। যাবতীয় প্রাণীর উদরে ও সূক্ষ্ম অস্থি সমূহে মেদ অবস্থিত। বৃহৎ অস্থিতে যে মেদ অবস্থান করে, তাহার নাম মজ্জা। অর্থাৎ মেদ—স্থূল অস্থির মধ্যগত হইলে তাহার নাম মজ্জা এবং সেই মজ্জা রক্তযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম অস্থিতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে মেদ বলে। চতুর্থী কলার নাম শ্লেষ্মাধরা কলা। প্রাণিগণের সকল সন্ধি স্থানেই ইহা অবস্থিত। যেমন

শকটে তৈল প্রদান করিলে চক্র সহজে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই প্রকার সন্ধিস্থান—কফ দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকিলে সন্ধিস্থানের সেই কার্য্য সমূহ সহজে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পঞ্চমী কলার নাম পুরীষ কলা। ইহা পক্কাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক কোষ্ঠ মধ্য হইতে মলকে বিভাগ করিয়া থাকে। এই কলা যকৃৎ, কোষ্ঠ ও অন্ত্র সমূহকে সমাশ্রয় পূর্ব্বক উণ্ডুকস্থ মলকে পৃথক করিয়া দেয়। ষষ্ঠী কলার নাম পিত্তধরা। আমরা যাহা কিছু ভোজন করি, ভক্ষণ করি, পান করি, তাহার সমস্তই এই কলার সাহায্যে পক্কাশয়ে আনীত হইয়া পিত্ততেজ দ্বারা পরিপাক করাইয়া যথাকালে জীর্ণ করাইয়া থাকে। সপ্তমী কলার নাম শুক্রধরা। ইহার অবস্থিতি স্থান প্রাণীদিগের সর্ব্ব দেহে। ইহার সাহায্যে প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে শুক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

**আশয়**—সাত প্রকার আশয়ের নাম ঋষি বলিয়াছেন, বাতাশয় পিত্তাশয়, কফাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্কাশয় ও মূত্রাশয়।

**অন্ত্র**—পুরুষ দিগের অন্ত্রের পরিমাণ সার্দ্ধ তিন ব্যাস এবং নারী দিগের অন্ত্রের পরিমাণ তিন ব্যাস।

**স্রোত বা দ্বারের বিবরণ**—দুই কর্ণ, দু'ই চক্ষু, নাসিকাদ্বয়, গুহ্য দেশ ও মেঢ্র—পুরুষদিগের এই নয়টী দ্বার বা স্রোত। স্ত্রীলোকদিগের ইহা ব্যতীত স্তনদ্বয় ও রক্তবহ অধোভাগস্থ আর একটী দ্বার আছে।

**কণ্ডুরা**—কণ্ডুরা ১৬টি, হস্ত, পদ, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ প্রত্যেক স্থানে ৪টী করিয়া ইহারা অবস্থিত। হস্ত ও পদ গত কণ্ডুরা হইতে নখ উৎপন্ন হয়। গ্রীবা ও হৃদয়স্থিত কণ্ডুরা হইতে মেঢ্র জন্মিয়া থাকে। শ্রোণি ও পৃষ্ঠ স্থিত অধোগত কণ্ডুরা হইতে নিতম্ব জন্মিয়া থাকে। গ্রীবাশ্রিত কণ্ডুরা হইতে মস্তক মণ্ডল, বক্ষোমণ্ডল ও স্কন্ধ মণ্ডল এবং উর্দ্ধগত পাদাশ্রিত কণ্ডুরা হইতে উরু মণ্ডলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

**জাল**—জাল চারি প্রকার। মাংস জাল, শিরা জাল, স্নায়ু জাল ও অস্থিজাল। ইহারা পরস্পর সন্নিবদ্ধ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পর ছিদ্রে মিলিত হইয়া প্রত্যেক মনিবন্ধে ও গুলফ দেশে এক একটি করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

**কূর্চ্চ**—কূর্চ্চ ছয়টী। ইহাদের মধ্যে হস্তে দুইটী, পদে দুইটি, গ্রীবা দেশে একটি ও মেঢ্রে একটি অবস্থিত।

**মাংসরজ্জু**—মাংসরজ্জু চারিটি। পৃষ্ঠ দেশের দুই ধারে পেশী বন্ধনার্থ দুইটি এবং মেরুদণ্ডের বাহিরে একটি ও অভ্যন্তর ভাগে একটি অবস্থিত।

**সেবনী**—সেবনী সাতটি। মস্তকে পাঁচটি, জিহ্বায় একটি এবং উপস্থে একটি।

**অস্থিসংঘাত** — অস্থিসংঘাত চৌদ্দটি। গুলফ, জানু ও বঙ্খন দেশে তিনটি, এই প্রকার অপর সকথিতে তিনটি, বাহুদ্বয়ে ছয়টি ও ত্রিক দেশে এবং মস্তকে এক একটি।

**সীমন্ত**—সীমন্ত চৌদ্দটি। ইহারা অস্থি সংঘাতের স্থলেই অবস্থিত।

**অস্থি**—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে সর্ব্ব সমেত তিনশত ছয়টি অস্থি বলিয়া থাকেন, কিন্তু শল্যবিদগণ ইহার সংখ্যা নির্ণয়ে তিনশত বলেন। মোটের উপর

ইহারা আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কপাল অস্থি, রুচক অস্থি, নলক অস্থি, তরুণ অস্থি, বলয় অস্থি। জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু শঙ্খ ও মস্তকে কপাল অস্থির অবস্থিতি স্থান। দন্ত সমূহকে রুচক অস্থি বলে। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোষস্থ অস্থি সমূহকে তরুণ অস্থি বলে। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এই সকল স্থানে বলয় নামক অস্থি অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অস্থি গুলির নাম নলকাস্থি।

সন্ধি—সন্ধি দুই প্রকার, এক প্রকার চেষ্টাশীল, ইহারা হস্ত, পদ, হনু, কটিদেশ ও গ্রীবাদেশে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন অপর সন্ধি গুলির নাম অচল সন্ধি। সন্ধি সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিলে দুইশত দশটি হইয়া থাকে। ইহাদের প্রকারভেদ করিলে এই সন্ধি আবার আটভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্ন সেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল এবং শঙ্খাবর্ত্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু ও কূর্পর—এই সকল স্থানে কোর নামক সন্ধি সকল অবস্থিতি করে। কক্ষদেশ, বঙ্ক্ষণ ও দন্ত দেশে উদূখল সন্ধির অবস্থিতি স্থান। স্কন্ধ-দেশ, গুহ্য, যোনি, নিতম্বদেশে সামুদ্গ নামক সন্ধি অবস্থিতি করে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশে প্রতর নামক সন্ধির অবস্থিতি স্থান। মস্তক, কটি ও কপালদেশের সন্ধির নাম তুন্ন-সেবনী। হনুর উভয় দিকের সন্ধির নাম বায়সতুণ্ড। কণ্ঠ, হৃদয়, নেত্র, ক্লোম ও নাড়ী দেশের সন্ধি সমূহকে মণ্ডলসন্ধি বলে এবং কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও নেত্রগত শিরা সমূহের সন্ধি সকলের নাম শঙ্খাবর্ত্ত। যে সন্ধি গুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল—ইহাদের সব গুলিই অস্থিসন্ধি। পেশী, স্নায়ু ও শিরা এই সকলের সন্ধির পরিচয় স্বতন্ত্র।

স্নায়ু। স্নায়ুর সংখ্যা নির্ণয়ে ইহারা নয় শত। প্রকার ভেদে ইহারা চারি প্রকার; যথা—প্রতানবতী, বৃত্ত, পৃথু ও শুষির। হস্ত, পদ ও সমস্ত সন্ধি স্থানে অবস্থিত যে সকল স্নায়ু তাহাদের নাম প্রতানবতী। যে সমস্ত স্নায়ু কণ্ডরা নামে অভিহিত, সেই সকল স্নায়ু বৃত্ত। যে সমস্ত স্নায়ু আমাশয় ও পক্কাশয়েরঅন্তে অবস্থিত—তাহাদিগের নাম শুষির এবং যে সমুদয় স্নায়ু পার্শ্ব, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ ও মস্তকে অবস্থিত—সেই সকলকে পৃথুল স্নায়ু বলিয়া থাকে।

পেশী। পেশীর সংখ্যা পাঁচ শত। পায়ের প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া ১৫টি, পায়ের অগ্রভাগে ১০টি, পায়ের উপরি কূর্চ্চদেশে ১০টি, গুলফ ও পদতলে ১০টি, গুলফ ও জানু উভয়ের মধ্যস্থলে ২০টি, জানুদেশে ৫টি, উরুদেশে ২০টি এবং বঙ্ক্ষণ দেশে ১০টি--সর্ব্ব সমেত এক সকথিতে ১০০টি। এইরূপ অপর সকথিতে ১০০টি এবং বাহুদ্বয়ে ২০০টি, সর্ব্ব সমেত হস্ত ও পদে ৪০০ শত পেশী আছে। ইহা ভিন্ন গুহ্যদেশে ৩, মেঢ্র দেশে ১, লিঙ্গের সেবনী দেশে ১, অণ্ডকোষে ২, দুই নিতম্বে ১০, বস্তির উপরিভাগে ২, উদরে ৫, নাভিতে ১, পৃষ্ঠের উপরিভাগে পাঁচ করিয়া ১০, পার্শ্ব দেশে ৬, বক্ষ দেশে ১০, স্কন্ধসন্ধির চতুর্দ্দিকে ৭, হৃদয় ও আমা-শয়ে ২, যকৃত, প্লীহা ও উণ্ডুকে ৬, গ্রীবাদেশে ৪, হনুদ্বয়ে ৮, কাকলকে ১, গলদেশে ১, তালুদেশে ২, জিহ্বাতে ১, ওষ্ঠদ্বয়ে ২,

নাসিকাপুটে ২, চক্ষুর্দ্বয়ে ২, গণ্ডস্থলে ৪, কর্ণযুগে ২, ললাটে ৪, এবং মস্তকে ১ সর্ব্বসমেত ৫০০টি। স্ত্রীলোকদিগের ইহা ভিন্ন আরও ২০টি অধিক পেশী আছে। তন্মধ্যে স্তনদ্বয়ে ১০, অপত্য পথে ৪, গর্ভছিদ্রে ৩ এবং শুক্রার্ত্তবের প্রবেশ পথে ৩—মোট ২০টিপেশী অতিরিক্ত।

**মর্ম্ম।**—মর্ম্ম স্থান একশত সাততি। উহাদিগের প্রকারভেদে উহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা, মাংস মর্ম্ম, শিরা মর্ম্ম, স্নায়ু মর্ম্ম, অস্থি মর্ম্ম এবং সন্ধি মর্ম্ম। ইহাদিগের মধ্যে মাংস মর্ম্ম এগারটি, শিরা মর্ম্ম এক চল্লিশটি, স্নায়ু মর্ম্ম সাতাশটী, অস্থি মর্ম্ম আটটি সন্ধি মর্ম্ম কুড়িটি।

**শিরা।**—শিরা সর্ব্বসমেত সাত শত। ইহাদিগের সকলগুলিই—নাভিমূলে সংলগ্ন। প্রাণী সমূহের প্রাণ নাভিতে অর্থাৎ নাভির আবরক শিরাসমূহে অবস্থিত। এই শিরা-গুলির মধ্যে মূল শিরা গুলির সংখ্যা ৪০টি, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ১০টি, পিত্ত বাহিনী ১০টি এবং রক্তবাহিনী ১০টি। ইহাদের মধ্যে আবার বায়ু বাহিনী ১৭৫টি, এই সকল শিরা বায়ুর স্থান—পক্কাশয়ে অবস্থিতি করে। পিত্ত বাহিনী ১৭৫টি, ইহারা পিত্তের স্থান পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করে। কফ বাহিনী শিরা ১৭৫টি, ইহারা কফের স্থান অর্থাৎ আমাশয়ে অবস্থিতি করে এবং রক্ত বাহিনী শিরা ১৭৫টী, ইহারা রক্তাশয়ে যকৃত ও প্লীহাতে অবস্থিত।

**শিরা সমূহের স্থাননির্ণয়**—বাতবাহিনী শিরা যাহা ১৭৫টী বলা হইল, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক সক্‌থিতে ও প্রত্যেক বাহুতে ২৫টী করিয়া এক শতটী, শ্রোণিদেশস্থ গুহ্যে ও মেঢ্রে আটটী, দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া চারিটী, পৃষ্টদেশে ছয়টী, উদরে ছয়টী এবং বক্ষ দেশে দশটী, স্কন্ধ-সন্ধির উপরি ভাগে গ্রীবাদেশে চৌদ্দটী, দুই কর্ণে চারিটী, জিহ্বা দেশে নয়টী, নাসিকায় ছয়টী ও চক্ষুদ্বয়ে আটটী—মোট ১৭৫টী বাতবাহিনী নাড়ী জানিবে।

**ধমনী**—ধমনী ২৪ প্রকার, ইহারা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ১০টি উর্দ্ধগামিনী, ১০টি অধোগামিনী এবং চারিটি তির্য্যকগামিনী। উর্দ্ধগামিনী দশটী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস উচ্ছ্বাস, জৃম্ভন (হাঁচি) ক্ষুৎ, হাস্য, কথন ও রোদন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই দশটি ধমনী হৃদয় দেশে গমন পূর্ব্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি করিয়া দশটি ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ও রস বহন করে। দুইটি করিয়া আটটি দ্বারা, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গৃহীত হয়। দুইটি দ্বারা বাক্য নিঃসরণ হয়। দুইটি দ্বারা অব্যক্ত শব্দ প্রকাশিত হয়। দুইটি দ্বারা নিদ্রা জন্মে। দুইটি দ্বারা জাগরণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। দুইটি দ্বারা অশ্রুজল প্রবাহিত হয়। স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ে যে দুইটি ধমনীর সাহায্যে স্তন্য বাহিত হয়, তাহাদিগকে ক্ষীর বাহিনী বলিয়া থাকে, ঐ দুইটি ধমনীই পুরুষের দেহে স্তনদ্বয় হইতে শুক্র বহন করিয়া থাকে। অধোগামিনী ধমনীদিগের

মধ্যে দশটি মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতিকে শরীরের অধোদেশে বহন করিয়া থাকে। ইহারা আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি করিয়া ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রসকে বহন করিতেছে। দুইটি অন্ন বহন করিতেছে। দুইটি অন্ত্রদেশে সংশ্রিত হইয়া জল বহন করিতেছে। দুইটি শুক্র প্রকাশ ও বহন করিতেছে। এবং ইহারাই স্ত্রীজাতির কলেবরে আর্ত্তব বহন করিতেছে। স্থূল অন্ত্রে সংলগ্ন দুইটী ধমনীর দ্বারা মল নিঃসারিত হইতেছে। এই আটটী ধমনী তির্য্যক গামিনী ধমনীগণের মধ্যে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম অর্পণ করিয়া থাকে। তির্য্যক গামিনী চারিটী ধমনীর প্রত্যেকটী উত্তরোত্তর শত শত সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা রূপে স্বয়ং বিভক্ত হইয়া শারীরিক রস দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সন্তর্পিত করিয়া থাকে।

স্রোত—স্রোত বহু সংখ্যক। তন্মধ্যে দুইটী প্রাণবহ, সেই দুইটী স্রোতের মূল—হৃদয় ও রস বাহিনী ধমনী সকল। দুইটী অন্নবহ, সেই দুইটির মূল আমাশয় ও অন্নবহা ধমনী সকল। দুইটী উদকবহ, সেই দুইটীর মূল। তালু দুইটী রক্তবহ, তাহাদের মূল যকৃত, প্লীহা ও রক্তবহা ধমনী সকল। রক্তবহ স্রোত দুইটী, তাহার মূল—হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী সকল। দুইটী মাংসবহ, তাহাদের মূল—স্নায়ু, ত্বক ও রক্ত বাহিনী ধমনী সকল। দুইটী মেদোবহ, তাহাদের মূল কটীদেশ ও বৃক্কদ্বয়। দুইটী মূত্রবাহী, তাহাদের মূল বস্তি ও মেঢ্র। দুইটী পুরীষ বাহী, তাহাদের মূল পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ। দুইটী শুক্রবহ, তাহাদের মূল স্তনযুগ ও বৃষণদ্বয়। দুইটী আর্ত্তবহ, তাহাদের মূল গর্ভাশয় ও ধমনী সকল।

**ডিসেকসন বা শবচ্ছেদ সম্বন্ধে**—সুশ্রুত সংহিতায় এইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যে দেহের কোনো অঙ্গ বিষ কর্ত্তৃক উপহত, বহু কালীন স্থায়ী ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ও একশত বৎসরের অধিক বয়সের না হয়, সেই মৃতদেহ সংগ্রহ পূর্ব্বক অন্ত্র অর্থাৎ নাড়ী ভুঁড়ি ও মল নিঃসারিত করিয়া মুঞ্জ, ছাল, শণ, কুশ প্রভৃতির কোনো একটীর দ্বারা সেই দেহ উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া একটী বড় খাঁচায় পুরিয়া স্রোতহীন নদীতে নির্জ্জনে রাখিয়া পচাইবে। সাতরাত্রি এইরূপ ভাবে পচাইয়া বেণার মূল, চুল, বাঁশের চটা, গাছের ছাল ও তুলি—ইহাদের যে কোনো একটীর দ্বারা আস্তে আস্তে ত্বগাদি ঘর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি সকল বিশেষরূপে দর্শন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি দেহে ও শাস্ত্রে শারীরিক বিষয় গুলি ঐক্য করিয়া শিক্ষা করেন, তিনিই চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারেন। মৃতদেহ ছেদন ও গুরূপদেশ দ্বারা সকল সন্দেহ মীমাংসা পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদে শারীর বিদ্যা বা অ্যানাটমীর পরিচয় আরও বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে, আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে অতি সংক্ষেপে তাহারই সারাংশ সঙ্কলন করিয়া

দিলাম মাত্র! যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অ্যানাটমী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনকারদিনের ডাক্তারি অ্যানাটমী অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের অ্যানাটমী কম উন্নত ছিল না, এখন চর্চ্চার অভাবে উহা লুপ্ত হইয়াছে এইমাত্র।

---

# রোগ-বিজ্ঞান

[ কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সামাধ্যায়ী ]

—:•:—

বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, ধেড়ে ও নেংটী ইন্দুরেরা যক্ষ্মাকাসের দ্বারা প্রায় আক্রান্ত হয় না। ইহাদের খাবারের মধ্যে অসংখ্য যক্ষ্মাজীবাণু মিশাইয়া দিলে বা দেহের ভিতর সূচের সাহায্যে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ করাইলে ইহাদের শরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ ফুটিবে না। তাই বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিলেন যে, পাথুরের ধূলার সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণু মিশাইয়া দেহে প্রবেশ করাইবেন। এই পরীক্ষার ফল হইল আশ্চর্য্য। পাথুরে ধূলার সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে প্রবেশ মাত্র ইন্দুরের শরীরে যক্ষ্মার চরম লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

পাথুরে ধূলা প্রত্যেক সহরের রাজপথে ছড়ান থাকে, সেই জন্যই গ্রাম অপেক্ষা সহরেই যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব বেশী।

রোগ জীবাণুকে নির্ম্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার। আমরা প্রত্যহই নিঃশ্বাসের সঙ্গে রোগ-জীবাণু গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের রোগাক্রান্ত না হইবার কারণ এই যে, আমাদের জীবনীশক্তি যেখানে স্বাস্থ্যের বিধি লঙ্ঘিত না হয় সেই খানেই প্রবল থাকে, সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত ধূলিকণারূপী রোগজীবাণুরা দেহে প্রবেশ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রাইট ডিজিজেরও রোগজীবাণু আছে; তাহারাও সর্ব্বাংশে ধূলা। অতএব মানবের স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ধূলার চেয়ে বড় শত্রু খুব কমই আছে। আরও কত রোগের মূল কারণ যে ধূলা তাহা কে বলিতে পারে?

প্রসিদ্ধ যক্ষ্মা চিকিৎসক ও যক্ষ্মারোগে Vegetabbs Prasin, ইঞ্জেক্‌সনের আবিষ্কার কর্ত্তা ডাক্তার হারবি বহু প্রকার পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন যে কচ্ছপ ও ছাগের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু প্রবেশ করাইলে সেই জীবাণুগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা ছাগ বা কচ্ছপের শরীরে রোগ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। এই সত্য যে, ডাক্তার হারবি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে; আদিম যুগের ঋষি সম্প্রদায় ইহার সত্যতা অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাই যক্ষ্মা রোগীর আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ছাগমাংসং পরচ্ছাগং ছাগং সর্পিঃসশর্করম্
ছাগোপসেবাশয়নং ছাগমধ্যেতু যক্ষ্মণুৎ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধপান, শর্করা সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগ মধ্যে শয়ন করিলে যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হয়। আরও ছাগঘৃত, ছাগ বিষ্টার রস, ছাগমূত্র, ছাগ দুগ্ধ ও ছাগ দধির দ্বারা প্রস্তুত "অজা-পঞ্চক ঘৃত" যক্ষ্মা রোগে মহোপকারী। ছাগের জীবাণু নাশকত্ব শক্তি আছে তাহা তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শুক্র-শোণিত প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুই কতকগুলি অণুগোলক বা call এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। এক বিন্দু রক্ত কণিকায় বহু call বা অনুগোলক বিদ্যমান থাকে—তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায়। সেই call গুলি আবার যে প্রটোপ্ল্যাজম্, ক্রমো-প্ল্যাজম্ ও নিউক্লিয়াসের সমন্বয়ে গঠিত হইয়া প্ল্যাজমা নামক জলীয় পদার্থে call রূপে বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম অণুগোলক বা call এরও জীবন আছে তাহা সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানে ৩য় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"সৌম্যং শুক্র মার্ত্তব মাগ্নেয়মতরেষামপ্যত্র
ভূতানাং সান্নিধ্য মস্ত্যনুনা বিশেষেণ
পরস্পরোপকারাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরা-
নুপ্রবেশাচ্চ।"

অর্থাৎ শুক্র সোমগুণ—বিশিষ্ট, রক্ত অগ্নিগুণ বিশিষ্ট; তথাপি এই দুই দ্রব্যে অন্যান্য ভূতদিগের সান্নিধ্য আছে, তাহারা এই সকল দ্রব্যে অণুভাবে আছে এবং অণু-ভাবে পরস্পর পোষিত ও পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়।

পুরুষের শুক্রস্থান যেমন অণ্ডকোষ, স্ত্রীলোকেরও শুক্রস্থান সেইরূপ ডিম্বকোষ (overy)। তথা হইতে শুক্রবাহী নলী (Phalapian tube) দিয়া স্ত্রী শুক্র গর্ভাশয়ে আসিয়া পড়ে। তথায় শুক্র গত কীট পুরুষের শুক্রগত কীটের সহিত অণুপ্রবিষ্ট হয়। স্ত্রী-শুক্রকীটকে ovam বলে।

সকল ধাতুর মধ্যস্থিত অণুগোলক গুলির যে প্রাণ আছে, তাহা পাশ্চাত্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত তাহা কোন প্রাচীন যুগে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেও সেই অতীতকালে যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সকল ভূত যে দেবযোনী বিশেষ নহে, জীবাণু মাত্র,—তাহা সুশ্রুত অন্যত্র বলিয়াছেন যথা—

নতে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি
নবা মনুষ্যান্ কচিদা বিশন্তি।
যে বা বিশন্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূত বিদ্যা বিষয়াদপোহ্যাঃ॥
তেষাং গ্রহানাং পরিচারকা যে
কোটী-সহস্রাযুত পদ্ম সংখ্যাঃ।
উত্তর তন্ত্রে ৬০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক।

ভূত অর্থাৎ দেবযোনীগণ কখন মনুষ্যের সহিত সংবিষ্ট হয় না, বা মনুষ্যে আবেশ করে না। যে বৈদ্য মুর্খতাবশতঃ বলেন যে ভূতগণ ঐরূপে সংবিষ্ট হয় অর্থাৎ মনুষ্যকে ভূতে পায় বা আবেশ করে, সেই বৈদ্যকে ভূতবিদ্যার অধিকার হইতে বাহির করিয়া

দেওয়া উচিত। মৃত অর্থাৎ দেবযোনী গণের কোটী-সহস্র অযুত পদ্ম ( অর্থাৎ অসংখ্য) পরিচারক আছে, এবং তাহারাই মানব শরীরে আবেশ করে।" ভূতগণের এই পরিচারক গুলিই যে Bacteria ( ব্যাক্টেরিয়া ) এবং তাহা জীবাণু যুক্ত, তাহা ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থংব্রুবতে বিষমজ্বরম"

এই পাঠ দ্বারা বুঝা যায় যে, ভূতাভিষঙ্গ হইতে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভূত অর্থে প্রাণী বা জীবাণু বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে জীবাণু বর্ত্তমান থাকে—তাহা রক্ত পরীক্ষা দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়। আর এই জ্বর বিষমজ্বরেরই অন্তর্গত। পাশ্চাত্যীয়েরা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জীবাণুকে পৃথক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ারই পুরাতন অবস্থা, কালাজ্বরে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পার্থক্য সম্বন্ধে কল্পনা করিতে পারা যায় যে, যেমন বেঙ্গাচী লাঙ্গুল খষিয়া জল হইতে ভূমিতে উঠিলেই বেঙ হয়, সেইরূপ নবজ্বরই তিন সপ্তাহ অতীত হইলে জীর্ণ জ্বরে পরিণত হয় ও জীর্ণ জ্বরই বিষমত্ব প্রাপ্ত হইলে বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং ম্যালেরিয়াই পুরাতন অবস্থায় কালাজ্বরে পরিণত হইয়া থাকে। জ্বরের প্রথম হইতেই জীবাণু সংস্থষ্ট থাকে, তবে ক্রমশঃ "ধাতুমন্তমং প্রাপ্তঃ কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরান্" রসধাতু হইতে রক্তধাতু প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কালাজ্বরে পরিণত করে। এইরূপ মাত্র গ্রাম্য কুচিকিৎসকের কুচিকিৎসাতেই ঘটিয়া থাকে; নবজ্বরে কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগই তাহার প্রধান কারণ, যে হেতু আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাওয়া যাগ যে—

"অক্ষি কুক্ষি ভবা রোগা প্রতিশ্যায় ব্রণ জ্বরাঃ পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ"

নেত্রগত, উদরগত রোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর পাঁচদিন লঙ্ঘন প্রদানেই আরোগ্য হয়, এই লঙ্ঘনের লক্ষণ কহিয়াছেন—

"অভূমিজং নিরাকারং পথ্যং ষড়্রস বর্জ্জিতং চরকেণ সমুদ্দিষ্টং লঙ্ঘনং পরমং মহৎ ॥"

নবজ্বরে এইরূপ উপবাস দেওয়াই উচিত, ঔষধ প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাই আত্রেয়—অগ্নিবেশকে "লালা প্রসেক হৃল্লাস হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ।"—প্রভৃতি নবজ্বরের লক্ষণ বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

"আমজ্বরস্যলিঙ্গানি ন দদ্যাৎ তত্র ভেষজং"

অগ্নিবেশও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন "ভেষজংহ্যামদোষস্য" যদি আম দোষের পরিপাক জন্য ঔষধ দেওয়া যায়?—আত্রেয় বলিলেন—"ভূয়োজ্বলয়তি জ্বরম্" পুনর্ব্বার জ্বর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। অগ্নিবেশ বলিলেন "শোধনং শমনীয়ঞ্চ?" শোধনীয় বা শমনীয় ঔষধ প্রদানে কি হয়? আত্রেয় বলিলেন—"কুর্ব্বন্তি বিষম জ্বরান্" সন্তত, সতত প্রভৃতি বিষম জ্বরে পরিণত হইবে। জ্বরের লক্ষণে বলিয়াছেন "আসপ্ত রাত্রং তরুণ জ্বরমাহুর্ম্মণিষীনঃ, মধ্যং দ্বাদশ রাত্রন্তু পুরাণ মত উত্তমম, ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতেতু জ্বরো য স্তনুতাং গতপ্লীহাগ্নিবাদং কুরুতে স জীর্ণ জ্বর মুচ্যতে" এই সাতদিন পর্য্যন্ত তরুণ জ্বরে জ্বরঘ্ন কষায়াদি নিষেধ করিয়াছেন—

কুইনাইন প্রভৃতি জরঘ্ন ঔষধ দেওয়া যাইতেই পারেনা। ঋষি বলিয়াছেন—

"কষায়ং য প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণে জরে স সুপ্তং কৃষ্ণসর্পন্তু করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥" তরুণ জরে কষায় প্রয়োগে সুপ্ত কৃষ্ণ সর্পকে করাগ্রের দ্বারা ধরিলে যে ফল হয়, সেই ফল হইয়া থাকে। ঋষি বলিয়াছেন—

"যঃ কষায় কষায়ঃস্যাৎতৎ বর্জ্জ্যস্তরুণেজ্বরে। নতু কষায় মুদ্দিশ্য কষায় প্রতিষিধ্যতে।

যাহা কষায় রস বিশিষ্ট, তাহাই তরুণ জরে বর্জ্জনীয়, অতএব দেখা যায় যে, কুচিকিৎসার ফলেই নবজরে জীবাণু সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাই ক্রমশঃ কালাজরে পরিণত হয়, নচেৎ কালা জরে পর্য্যবসিত হইলেই যে, জীবাণুর আবেশ হয় তাহা নহে। রায় বাহাদুর ডাঃ হরি নাথ ঘোষ এম, ডি মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মশক দংশনেও কালাজর হইয়া থাকে। মশক দংশনে কিন্তু ম্যালেরিয়া জর উৎপন্ন হয় ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ম্যালেরিয়া ও কালাজরে নিদান অভিন্ন।

( ক্রমশঃ )

---

# কায় চিকিৎসা ক্রমোপদেশ।

## তৃতীয় খণ্ড।

[ কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ]

### ( বাতব্যাধি )

—:*:—

সাধারণতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সংজ্ঞা বাতব্যাধি প্রদান করা যায়। শাস্ত্রে এই বাতব্যাধির প্রকার ভেদ আশী প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিরোগ্রহ, অঙ্গ কৃশতা, অত্যন্ত জৃম্ভা, হনুগ্রহ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্‌গদত্ব, মিন্‌মিনত্ব, মূকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভিজ্ঞতাবাধির্য্য কর্ণনাদ, স্পর্শাজ্ঞত্ব, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাতাষ্ঠীলা, প্রতিষ্ঠিলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ, পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহুর্মূত্রণ, মূত্রনিগ্রহ, মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি, গৃধ্রসী, কলায় ভঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুশীর্ষক, খল্লী, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, আক্ষেপ ও দণ্ডক, কফপিত্তানুবন্ধ, আক্ষেপ, ও দণ্ডাপ-তানক রোগ, অভিঘাত জন্য আক্ষেপ, অন্তর আয়াম, ও বহিরায়াম ভেদে দুই প্রকার আয়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জক, অপতন্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলান্ধ, কম্প, স্তম্ভ,

ব্যথা, তোদ, ভেদ, স্ফুরণ, রৌক্ষ্য, কার্শ্য, কার্ষ্ণ্য, শৈত্য, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ্দন, অঙ্গ বিভ্রংশ, শিরা সঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও পরিভ্রম। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়টি সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক প্রতীকারোপায় বলা যাইতেছে।

**আক্ষেপ, অপতন্ত্রক, অপতানক**। আক্ষেপের সাধারণ নাম খিচুনি। যে রোগে বায়ু—হৃদয়, মস্তক ও ললাট দেশের পীড়া জন্মাইয়া দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষেপযুক্ত করিয়া থাকে, তাহার নাম অপতন্ত্রক। এই অপতন্ত্রক রোগে রোগী মূর্চ্ছিত, নিমীলিত চক্ষু ও সংজ্ঞাহীন হয়। কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ এবং পারাবতের ন্যায় শব্দোচ্চারণও এই রোগে হইয়া থাকে। অপতানক রোগে যখন বায়ু হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া এই রোগ প্রকাশিত হয় এবং বায়ু হৃদয়ে চলিয়া গেলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে। এই রোগে দৃষ্টিশক্তির নাশ, সংজ্ঞা লোপ এবং কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

**দণ্ডাপতানক**—রোগে কুপিত বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত ধমনীকে অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় শরীরকে স্তম্ভিত করিয়া তাহার আকুঞ্চনাদি শক্তি নষ্ট করে।

**ধনুঃস্তম্ভ**- ইহার চলিত নাম ধনুষ্টঙ্কার। অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে এই ব্যাধি দ্বিবিধ। এই রোগে অতি কুপিত বলবান বায়ু অঙ্গুলি, গুল্‌ফ জঠর, বক্ষঃস্থল, হৃদয় ও গলদেশের স্নায়ু সমূহকে আকর্ষণ করিলে রোগী ক্রোড়াভিমুখে নত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থার নাম অন্তারায়াম। এই অবস্থায় রোগীর চক্ষুর্দ্দয় স্তব্ধ হয়, চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কফ উদগীর্ণ হইতে থাকে। বহিরায়াম ধনুষ্টঙ্কারে বায়ু পৃষ্ঠের দিকে স্নায়ু সমূহ আকর্ষণ করায় রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বক্ষঃস্থল, কটি ও উরু ভগ্নবৎ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ধনুঃস্তম্ভ অসাধ্য জানিবে। গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব এবং আঘাতাদির ফলেও এইরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহাও অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।

**পক্ষাঘাত বা একাঙ্গ ঘাত**।—এই রোগ দুই প্রকার। কাহার ও বাম-দক্ষিণ বিভাগের, একভাগে কাহারও কটি দেশের উর্দ্ধ ও অধোভাগানুসারে এক ভাগে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হওয়ায় শিরা ও স্নায়ু সমূহ সঙ্কুচিত ও বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সম্যক প্রকারে বিশ্লিষ্ট হয়, এজন্য যে ভাগে এইরূপ অবস্থা হয় সেই ভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন প্রায় হইয়া উঠে।

**অর্দ্দিত**—এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা প্রদেশ বক্র করে এবং শিরঃ কম্প, বাক্য নিরোধ এবং নেত্রাদির বিকৃতি উৎপাদন করে। এই রোগ মুখের যে পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে, সেই

পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে। এই রোগ যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত অচিকিৎসা রাখা যায়—তাহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।

**হনুগ্রহ**—কঠিন দ্রব্য চর্ব্বন বা কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তির জন্য হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুদ্বয় অর্থাৎ চোয়াল শিথিল করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে মুখ বুজিয়া থাকিলে হাঁ করা যায় না।

**মন্যাগ্রহ**—এই রোগে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যা অর্থাৎ গ্রীবা দেশস্থ শিরা দ্বয়কে স্তিম্ভত করে, তজ্জন্য গ্রীবা ফিরাইতে পারা যায় না।

**জিহ্বাস্তম্ভ** এই রোগে কুপিত বায়ু বাগবাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া, পান, ভোজন এবং বাক্যকথনের শক্তি লোপ করিয়া থাকে।

**শিরোগ্রহ**—এই রোগে গ্রীবদেশস্থ শিরা সমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইয়া শিরা সকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণত্ব করিয়া থাকে। এই রোগে আক্রান্ত রোগী মস্তক চালনা করিতে পারে না। এ রোগ অসাধ্য।

**গৃধ্রসীবাত**—এই রোগে প্রথম স্ফিক ( পাছা ), তৎপরে যথাক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা,বেদনা ও সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

**বিশ্বচী**—বাহুর পশ্চাদভাগ হইতে যে সকল বড় বড় শিরা অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, বায়ু কর্ত্তৃক সেই শিরাগুলি দূষিত হইলে বাহু অকর্ম্মণ্য ও আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়াশূন্য হইয়া থাকে। ইহারই নাম বিশ্বচী। ইহা একটী বা দুইটী বাহুতেও হইতে পারে।

**ক্রোষ্টুক শীর্ষ**—এই রোগে কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া জানুমধ্যে শৃগালের মস্তকের ন্যায় এক প্রকার শোথ উৎপন্ন করে।

**খঞ্জতা পঙ্গুতা, কলায় খঞ্জ**—কটি দেশস্থ কুপিত বায়ু যদি এক উর্দ্ধ জঙ্ঘার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে তাহা হইলে খঞ্জতা, দুই পায়ের জঙ্ঘা দেশস্থ শিরা আকর্ষণ করিলে পঙ্গুতা এবং যে রোগে পা ফেলিবার সময়পা কাঁপিতে থাকে, তাহার নাম কলায়খঞ্জ বলিয়া জানিবে।

**বাত কণ্টক**—অসম অর্থাৎ উচু নিচু পাদ বিন্যাস এবং বায়ু প্রকোপের ফলে গুলফদেশে বেদনার উৎপত্তি এই রোগে হইয়া থাকে।

**পাদ-দাহ, পাদহর্ষ**—অতিরিক্ত ভ্রমণের ফলে পিত্ত, রক্ত, ও বায়ু কুপিত হইয়া পাদদাহ রোগ জন্মাইয়া থাকে। পাদদ্বয় স্পর্শ শক্তি হীন, বারংবার রোমাঞ্চিত এবং ঝিন্ ঝিনি বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে পাদহর্ষ বলা যায়।

**অংশশোষ**—স্কন্ধ দেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া স্কন্ধের বন্ধন স্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া এই রোগ জন্মাইয়া থাকে।

**অববাহুক**—স্কন্ধস্থিত কুপিত বায়ু শিরা সমূহকে সঙ্কুচিত করিলে তাহাকে অববাহুক বলে।

**গদগদ ভাষী**—কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দ বাহিনী ধমনী সমূহকে দূষিত করিয়া

মিন্ মিনে, গদ গদ ভাষী এবং বোবা করিয়া থাকে।

**তূনীওপ্রতি তূনী** এই রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া গুহ্য দেশ, লিঙ্গ বা যোনি দেশে বিদারণবৎ বেদনা জন্মাইয়া থাকে। ঐরূপ বেদনা গুহ্য দেশ, লিঙ্গ বা যোনী প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া প্রবল বেগে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী বলিয়া থাকে।

**আধ্মান ও প্রত্যাধ্মান**—পক্কাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিয়া উদরকে স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং গুড় গুড় শব্দ বিশিং করিলে তাহাকে আধ্মান এবং ঐ বেদনা পক্কাশয় হইতে না হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হইলে এবং উদর বা পার্শ্ব দেশে স্ফীতি না থাকিলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহিয়া থাকে।

**অষ্টীলা ও প্রত্যষ্টীলা**—নাভির অধোভাগে পাষাণখণ্ডের ন্যায় কঠিন, উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রন্থি বিশেষ উৎপন্ন হইলে অষ্টীলা ও উহা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে প্রত্যষ্টীলা কহিয়া থাকে। এই উভয় রোগেই মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

**বেপথু**—সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকিলে তাহাকে বেপথু বলে।

**খল্লী**—পদ, জঙ্ঘা, উরু, ও করমূল মোচড়াইলে তাহাকে খল্লী বা খালধরা বলে।

এইবার বিবিধ বায়ু বিকারের চিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে—

**অপতন্ত্রক ও অপতানক রোগে**—চেতনা সম্পাদন জন্য—মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলসী পত্র সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া নস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব লবণ, থৈকল—এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। দশমূলের ক্কাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ চুর্ণের সহিত অম্ল দধি ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই রোগে অপতর্পণ নিরূহবস্তি ও বমন প্রয়োগ কদাপি করিবে না।

**পক্ষাঘাত রোগে**—মাষ কলাই, আলকুশী মূল, এরণ্ড মূল, ও বেড়েলা—ইহাদের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। পিঁপুল মূল, চিতামূল, পিঁপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব—ইহাদের কল্ক এবং মাষকলাইয়ের ক্বাথের সহিত যথাবিধি তৈলপাক করিয়া মর্দ্দন করাইবে। মাষ-কলাই, আলকুশী মূল, আতইচ, এরণ্ড মূল, রাস্না, শুলকা, ও সৈন্ধব—এই সকল দ্রব্যের কল্ক তৈলের চতুগুণ পরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক পৃথক ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করাইবে।

**অর্দ্দিত রোগে**—মুখ বিকৃত হইলে অর্থাৎ হাঁ করিয়া থকিলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা হনুস্থান ও তর্জ্জনীয় দ্বারা চিবুক ধরিয়া ছাপ দিয়া সংবৃত করিয়া দিবে। হনু শিথিল হইয়া পড়িলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে। মুখ স্তব্ধ হইয়া থাকিলে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য।

রসোন এই রোগে বিশেষ হিতকর। রসোন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত এই রোগে সেবন করা কর্ত্তব্য। বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ, ও এরণ্ডমূল,—ইহাদের ক্কাথ পান করিলে এবং ঐ ক্কাথের নস্য লইলে অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগ নষ্ট হয়। অর্দ্দিত রোগে স্নেহ পান, নস্য, বাতঘ্ন দ্রব্য আহার এবং শিরো-বস্তি উপকারী। দশমূলীর ক্কাথ বা ছোলঙ্গ লেবুর রস কিম্বা বেড়েলা অথবা পঞ্চমূলীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান এই রোগে হিতকর। পিষ্ট মাংস ও ঘৃত ও নবনীতের সহিত ভোজন করিয়া অথবা দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত ভোজন করিয়া দশমূলীর রস পান করিলেও অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হয়। এই রোগ পিত্তজন্য হইলে শীতল দ্রব্য ও স্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ প্রশস্ত। ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বস্তিক্রিয়াও এ অবস্থায় উপকারী। কিন্তু এই রোগে যদি মুখ বক্র ও বাক্যোচ্চারণ শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে, এবং দাহ হইতে থাকে, তাহা হইলে বায়ু পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে। যদি অর্দ্দিত রোগ শোথসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বমনক্রিয়া এই রোগে সুপ্রশস্ত।

**মন্যাস্তম্ভ রোগে**—দশমূলীর ক্কাথ কিম্বা পঞ্চমূলের ক্কাথ পান এবং রুক্ষ স্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। এই রোগে তৈল বা ঘৃত গ্রীবা দেশে মর্দ্দন করতঃ আকন্দ পত্র বা ভেরেণ্ডার পাতার দ্বারা উহা আবৃত করিয়া বায়ংবার স্বেদ প্রদান করিবে। কুকুড়ার ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ গরম করিয়া গ্রীবা দেশে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। অশ্বগন্ধা মূলের প্রলেপ এবং খাঁটী সরিষার তৈল মর্দ্দন এই রোগে হিতকর।

**গদ্গদ ভাষী**—রোগে—ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের কবলধারণ হিতকর। এই রোগে নিম্ন লিখিত তৈল সেবনের ব্যবস্থা করিও, বিশেষ উপকার পাইবে।

ঘৃত /৪ সের—
কল্কার্থ—সজিনার ছাল
বচ
সৈন্ধব—
ধাইফুল—
লোধ—
আকনাদি—
প্রত্যেক ৶—অর্দ্ধপোয়া। জল ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। যথানিয়মে—পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য।

(ক্রমশঃ)

# কচুরী পানায় ম্যালেরিয়া।

[ শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, এম, আর, এ, এস ]

—:০:—

কচুরীপানার অন্য নাম কচরী মান বা জর্ম্মনী পানা ইহাদের অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হয়। একটা পুকুরে ক্ষুদ্র এক টুকরা কচুরী পানার পাতা ফেলিয়া দিলে দু'এক মাসের মধ্যে সে পুকুরে আর কিছু দেখা যায় না। এই পানা যেখানে থাকে। অন্য ঘাস সেখানে জন্মিতে পারে না। ইহার ফুলের কেশর বাতাস সাহায্যে উড়িয়া যেখানে যায়। সেস্থানে পর্য্যন্ত এই ঘাস জন্মায়। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ইহার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, নদী, খাল, বিলে নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়াছে, শস্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার ধ্বংস কারণ বহু চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়া আচার্য্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর নায়কত্বে এক কমিটী গঠন করিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত ফলাফল নির্দ্দেশ হয় নাই। রৌদ্রে শুকাইয়া আগুণ দিয়া পোড়াইলেও ইহার ধ্বংস হয় না। পোড়াইয়া দেখা গিয়াছে, ইহার ভস্ম রাশি বায়ু আশ্রয়ে যেখানে গিয়া পড়িয়াছে,সেখানেই ইহার চারা জন্মাইয়াছে। মানবের এমন শত্রু দ্বিতীয় আর হয় নাই। যেখানে কচুরী পানা হয়, সে জলাশয়ের মাছগুলি মরিয়া যায়, ইহার জল মানুষের অপেয় হয়, জল কথঞ্চিৎ নীল ও কালো বর্ণ হয়। কোন ইংরেজ ইহার ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে ইহা এদেশে আনিয়াছিলেন।

কচুরীপানা যেখানে জন্মায়, তাহার চতুর্দ্দিকে জ্বর হইতে থাকে, এই জ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়াই চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় ইহার বাতাসে জ্বর উৎপন্ন হয়, ইহার জল পান করিলেও জ্বর হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি অতি মাত্রায় হয়। এই সময়ই জ্বর হইতে আরম্ভ হয়, কার্ত্তিক মাসে জ্বরের প্রাদুর্ভাব প্রবল দেখা যায়। এই সময় জ্বরঘ্ন ঔষধ কিছু কিছু খাইলে এই জ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। পার্ব্বত্যনদী সমূহ পর্ব্বত হইতেও কচুরা পানা বহন করিয়া স্রোতযোগে নিম্ন প্রদেশে আনিয়া ফেলে। কিরূপে পার্ব্বত্য প্রদেশে কচুরা পানা গিয়া উপস্থিত হইল, তাহার তত্ত্ব মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। ইহার ধ্বংস কিরূপে করা যায় তাহার মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। আমেরিকাতেও কচুরী পানা বিস্তৃত হইয়া বিধ্বস্ত করিতেছে, কিন্তু ধ্বংসের উপায় নিরাকরণ হয় নাই।

সকলেই কচুরী পানা পোড়াইয়া ইহার ধ্বংসের সহায়তা করুন। ইহার ভস্ম জমির

উৎকৃষ্ট সার। ইহার ধ্বংস করিলে স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল হইবে, মৎস্যবংশ বাঁচিবে, ছাই দিয়া জমির সার হইবে। নৌকা চলাচলও হইতে পারিবে। দুষ্ট লোকেরা শত্রুতা করিয়া কোন কোন পুকুরে ইহার পাতা, ফুল বা গাছ ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পুকুরের স্বামী ইহা দেখিবা মাত্রই অবিলম্বে ফেলিয়া না দিলে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ইহা মানুষের প্রবল শত্রু। গো, মহিষাদি ইহা খায় না, যদি ইহা কোন কোন গো মহিষাদিকে কদাচিৎ খাইতে দেখা যায়—পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সে সকল গবাদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের দুগ্ধ কমিতে থাকে। যে সকল জমীতে কচুরীপানা প্রবেশ করে, তাহা ফসল জন্মাইবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থানের লোক ইহার ফুল তেলে ভাজিয়া খায়, কিন্তু ইহা বেশী খাইলে শরীরে বেদনা হয় ও গা ঝিমঝিম করে ও পরে জ্বর হয়। কচুরীপানা দুই তিন জাতীয় আছে সকলেই একই প্রকার ভাব বংশ বৃদ্ধি হয় ও সকলগুলিই এক প্রকারে সমভাবে অনিষ্টকারক। আমরা আশা করি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানবলে ইহার ধ্বংশের পথ নিরাকরণ করিয়া দিবেন। এখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হাতেই এ বিষয়ের ভার দিয়াছেন।

---

# ম্যালেরিয়া।

[ শ্রী—পাইকর—বীরভূম ]

—:•:—

শরীরে সামদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ উপস্থিত হইলেই যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ তাহাকে নিজের অধিকৃত দেহরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া জ্বর নামে পরিচিত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য শারীরিক এবম্বিধ ক্রিয়া চিন্তা করিয়াই আমাদের দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জ্বরের সময় জ্বরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রথমতঃ যে কারণে জ্বর হইয়াছে তাহার প্রতি অর্থাৎ সাম দোষেরই প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা জানেন যে, চক্ষুতে ধূলিকণাদি পতিত হইলে যেমন চক্ষু হইতেই জল নিঃসৃত হইয়া তাহা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে, তেমনই দেহে দোষ উপস্থিত হইলে দেহ হইতেই তাপ ফুটিয়া সেই দোষকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করে। অতএব যিনি সুচিকিৎসক, তিনি জ্বর রোগীর চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কখনই জ্বরকে বাধা দেন না। পরন্তু তিনি কেবল জ্বরের কারণ সেই দোষেরই প্রশমন করে

ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। প্রবীন ও ভূয়োদর্শী চিকিৎসকগণ জানেন,—

"আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামোমার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

অন্বয়ঃ—আমাশয়স্থঃ সামঃ দোষঃ অগ্নিং হত্বা মার্গান্ পিধাপয়ন্ জ্বরং বিদধাতি।
তস্মাৎ লঙ্ঘনং আচরেৎ॥

বঙ্গানুবাদ—আমাশয়ে বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ উপস্থিত হইলে উদরাগ্নি আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে সেই অগ্নি হীনবল হওয়ায় যে যে পথ দিয়া তাহার তাপ চলাচল করতঃ সমস্ত শরীরকে প্রতপ্ত করে, সেই সেই পথগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উদরাগ্নি স্থানচ্যুত হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্যেরও পরিপাক হয় না। অতএব জ্বরের সময় উপবাস দেওয়া উচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শরীরে সামদোষ উপস্থিত হইলে উদরাগ্নি থাকে কোথায়? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই অগ্নি হীনবল হইয়া শরীর ত্যাগ করে না। তবে রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তাহার যে দুরবস্থা ঘটে, উদরাগ্নিরও তাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। কেবল প্রাণেই বাঁচিয়া থাকে মাত্র। মহাবীর নেপোলিয়ান যখন সর্ব্বক্তিবিচ্যুত হইয়া সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার অবস্থার সন্ধান লইবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—How do you live now? অর্থাৎ এখন কেমন আছেন? তিনি তাহার উত্তরে বলেন—I do not live now, I merely exist. অর্থাৎ আমি এখন নাই বলিলেই হয়, কেবল প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করিতেছে। বলাবাহুল্য দোষের বর্ত্তমানে জঠরাগ্নিরও এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত নয়। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে, দেহস্থ এই অগ্নি কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয় না। অর্থাৎ সে সুযোগ পাইলেই তাহার স্বভাব শত্রু সামদোষকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। মহাবীর নেপোলিয়নও প্রথম প্রথম ২।১ বার সুযোগ পাইয়া এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত বা কফের কোন দোষ উপস্থিত হইলেই আমাদের শরীরে ভার বোধ হয়। এই দোষের মাত্রানুসারে শরীরের এই ভারও ন্যূনাধিক উপলব্ধি হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ উপলব্ধির কাল উপস্থিত হইলেই জঠরাগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই স্বভাব শত্রু দোষকে আক্রমণ করিবার জন্য কেবল সুযোগই অনুসন্ধান করে। যে মুহূর্ত্তে সুযোগ পায়, সেই মুহূর্ত্তেই দোষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাকে জব্দ করিতে আরম্ভ করে। একবার আক্রমণের ফলেই যদি রোগের পরাজয় ঘটে, তাহা হইলেই অগ্নিরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয় এবং তৎসহ দোষেরও পরাজয় অর্থাৎ পরিপাক হইয়া শরীর সারিতে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় জ্বর ছাড়িয়া যায়, অথচ শরীর ভারই থাকে। ইহাতে এই ঘটনা ঘটে যে, অগ্নি দোষকে হীনবল করে বটে, কিন্তু অল্লাধিক পরিমাণে অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কাজেই যে পরিমাণে দোষ থাকিয়া যায়, সেই পরিমাণেই তাপ পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে নাশ করিতে থাকে। শেষে দোষ নাশ হইলে তাপের বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্বরও কমিয়া স্বাভাবিক তাপে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, ইহারই নাম সবিরাম

জ্বর। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায় জ্বর একেবারেই ছাড়ে না। তখন বুঝিতে হইবে যে,জ্বরের আক্রমণে দোষ সম্যক পরাভূত হয় না। চিকিৎসকগণ এই জ্বরকেই অবিরাম জ্বর অর্থাৎ রেমিটেণ্ট্ জ্বর বলেন। দোষের ক্ষয়ের মাত্রানুসারে এই জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া থাকে।

অতএব দোষ ও তাপের যখন এইরূপ সম্বন্ধ, তখন চিকিৎসার সময় যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক—তাহা কোন সুচিকিৎসক কেন, যে কোন সাধারণ লোকই সহজে বুঝিতে পারেন। মোটের উপর দেখা যায়, জ্বর নিবারণ করিতে হইলে যাহাতে দোষের নিবারণ হয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই সর্ব্বাগ্রে তাহা চিন্তা করা উচিত। তবে ইহা স্থির যে, যাঁহারা ১ম শ্রেণীর বুদ্ধিমান তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া দোষকেই শরীরে প্রবেশ করিতে দেন না। কারণ তাঁহারা জানেন—Prevention is better than cure. অর্থাৎ রোগ দূর করা অপেক্ষা রোগ হওয়ার মূল কারণ দূর করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মূলতঃ এইরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। পল্লীগ্রাম ও সহরের ম্যালেরিয়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামেই ইহার প্রকোপ বেশী। সুচিকিৎসকগণ বলেন,—প্রধানতঃ ইহার কারণ দ্বিবিধ, ১ম কারণ সহরের লোক বেশী জ্ঞানী বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত নিয়ম পালন করেন। আর ২য় কারণ, পল্লী অপেক্ষা সহরে অধিকতর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এই দ্বিবিধ কারণই উপেক্ষণীয় নহে। তবে আমাদের মনে হয় যে, ২য় কারণটাই পল্লীগ্রামের মারাত্মক ম্যালেরিয়ার প্রধান হেতু।

কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ তাঁহার প্রণীত "জ্বরতত্ত্ব ও কাটানুতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন —"অজীর্ণ রসের (দোষের) মাত্রা যত অধিক হয়, জ্বরও সেই অনুপাতে বেশী হয়" এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যদি অসময়ে বা অসদুপায়ে (অস্বাভাবিক উপায়ে) ঐ জ্বরকে যাহারা বন্ধ করিবার জন্য প্রবল যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়িয়া বসেন না? আর এই বানরের হুঙ্কারে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্পান্বিত হইয়া স্বর্গ হইতে ও মনোরম জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এবং পল্লীগ্রামে যাইতে শঙ্কাবোধ করেন। তাঁহারা বুঝিয়া দেখেন না যে, পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত ডাক্তারেরা কোন ব্যক্তির জ্বর হইবামাত্র ২।৩ দিনের মধ্যে প্রথমে জোলাপ, পরেই ১০।১৫ গ্রেণ কুইনাইন দিয়া থাকেন। অজীর্ণ রসের আধিক্য বশতঃ কুইনাইন সেবনের পরেও যদি জ্বর আসিল তবে পরদিনে ৪০ গ্রেণ কুইনাইন দিয়া বসিলেন। কি জন্য যে জ্বর বন্ধ হইতেছেনা, তাহাও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে সমস্ত চিকিৎসকেরা এই জ্বর অসময়ে (অর্থাৎ জ্বরকারক অজীর্ণ রস ক্ষয় হইবার পূর্ব্বে) যে ঔষধ দ্বারা বন্ধ করিয়া থাকেন, সে ঔষধের কার্য্যকারিতা যে সন্দেহের বিষয় একথা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অনিষ্ট সাধনে চিকিৎসক বা রোগী কেহই সঙ্কুচিত হয়েনা।"

বলা বাহুল্য কবিরাজ মহাশয় পল্লীগ্রামের জ্বর চিকিৎসার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,

তাহা সত্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ভয়ঙ্করী অল্প বিস্তার ফলে এখন সকলেই ইহা শিখিয়াছেন যে, জ্বর হইলেই তাহা বন্ধ করিতে হইবে। কেন জ্বর হইল, অকালে জ্বর বন্ধ করিলে কোন কুফল ফলিবে কিনা, অকালে জ্বর বন্ধ করিলে পরিণাম কি?—ইত্যাদি কোন বিষয় চিন্তা না করিয়াই কেবল জ্বর বন্ধ করিবার জন্য পল্লীবাসিগণ উৎকর্ণ ও উদ্গ্রীব হইয়া এক প্রকার মারাত্মক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। একটি পয়সা দিলেই প্রত্যেক ডাকঘরে কুইনাইন মিলে, অপিচ গবর্ণমেণ্টও এখনও পল্লীতে পল্লীতে কুইনাইনের দানসাগর করিতেছেন। কাজেই জ্বরের কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া কেবল পুষ্টিলাভই করিতেছে এবং তৎসহ যে ভাগ্যবান্ জ্বরের কারণ নষ্ট হয় তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ফলে দেখা যায়, লোকে এই জ্বরতত্ত্ব অবগত নহে বলিয়া আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কবিরাজের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চন করেন, যাঁহারা আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের যুগযুগান্তর ব্যাপী শাসন মানিতে অসম্মত, আমরা তাঁহাদিগের জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ইউষ্টেন্ মাইলস্ প্রণীত "Avenues to health" নামক সর্ব্বজন সমাদৃত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—"Disease is a blessing not only as a consequence to teach as our mistakes, but also an active agent as doing the work of nature, as helping to remove our mistakes. Fever is an example. We call it illness, but it is really an effort of nature to burn up the poision within us. And may be some day all disease —may, even all disease germs— will be proved to have a like function, and to be fatal only when wrongly treated."

বঙ্গানুবাদ—"রোগ আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; কারণ আমরা যখন ভ্রান্তিবশে বা সংযমের অভাবে অত্যাচার করিয়া থাকি, সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার জন্যই রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জ্বর ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্বরের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের শরীরস্থ দোষকে নষ্ট করিয়া দেহকে পুনরায় বিশুদ্ধ করিবার জন্য যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। * * * এবং এই রোগ চিকিৎসিত হইলে (অর্থাৎ যে উদ্দেশে রোগ হইয়াছে সেই উদ্দেশের বাধা জন্মাইলে) জীবন পর্য্যন্তও নাশ করে।"

আজকাল অকালে জ্বর বন্ধ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি অতিমাত্রায় গজাইয়া উঠায় দেশের যে কিরূপ অপকার হইতেছে—তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এখন জ্বর হইলেই কুইনাইন বা তাহার সমধর্ম্মা অন্য কোন কষায় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য বৈদ্যশাস্ত্রে জ্বরের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ সামদোষ থাকা কালীন কষায় ঔষধ দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কারণ কষায় ঔষধ প্রয়োগের ফলে জ্বর মন্ত্রপূত সর্পের ন্যায় শক্তিহীন হয় এবং তাহার ফলে জ্বরের

কারণ যে আম দোষ তাহা পুষ্টিলাভ করে বটে, কিন্তু তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বৈদ্যশাস্ত্র কষায় ঔষধ কুইনাইন প্রভৃতির প্রয়োগ যে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা বলেন যে, নবজ্বর যখন নিরামজ্বরে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন সামদোষ পরিপাক হইয়া যায়, তখন কষায় ঔষধ ব্যবহার করিলে সুফলই প্রসূত হয়। এই উক্তির সমর্থন করিয়া সুশ্রুত বলেন,—

"মৃদৌ জ্বর লঙ্ঘ্যে দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং
তদৌষধম্॥"

নিরাম জ্বরের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরক বলেন :—

"ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বর লক্ষণম্॥"

এরূপ মূল্যবান্ বচন উপেক্ষা করিয়াও যাঁহারা কুইনাইন প্রভৃতি কষায় ঔষধ নবজ্বরে ব্যবহার করিবার বা করাইবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে একবার মনোযোগসহকারে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ১৯১২ সনের স্বাস্থ্য বিবরণী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তৎপাঠে জানা যায় বাঙ্গালার প্রত্যেক পল্লীসমূহে অজস্র কুইনাইন দান করিয়া তাহার যে ফল হইয়াছে তাহাতে মহামতি গবর্ণর বাহাদুর সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এখন যাঁহারা চিকিৎসা রাজ্যের রাজা তাঁহারাই উক্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। এই বিবরণী পাঠান্তেই গবর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"The Governor in Council is also disappointed to find that despite the employment of Sub-Assistant Surgeons in the distribution of quinine in the District of Nadia and Murshidabad there has been no diminution in fever morlatity but the reverse." The Government Resolution on the Sanitary Reports for the year 1912.

---

# বাবুমহলে হার্টফেল।

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

[ শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ]

—:০:—

ছেলে বেলায় আমাদের নাম থাকে—ননী, মাখন, মিছরী ইত্যাদি ; কারণ কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি ঠাকুরদের নাম এখন নিতান্ত পুরাণ ও সেকেলে বলিয়া পিতামাতার

পছন্দ হয় না। বাল্যকালে যদিও গায়ে একটু জোর থাকে, অনায়াসে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া যাই, পাঁচ সের দ্রব্য স্বহস্তে বাজার হইতে গৃহে আনি, এক থাল ভাত ব্যঞ্জন খাইয়া হজম করিতে পারি; কিন্তু বড় হইয়া আপিষে কেরাণী গিরি বা অন্যবিধ চাকুরী করিয়া মাসিক কিছু কিছু নগদ টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেই আমাদের রংটা বেশ ফরসা হয়, দেহে একটু জোয়ার আসে এবং নামের গায়ে বাঙ্গালীর বড় সাধের 'বাবু' উপাধি সংযুক্ত হয়। তখন আমরা হই—ননী বাবু, মাখন বাবু, মিছরী বাবু ইত্যাদি। যেই বাবু, অমনি কাবু! কি আশ্চর্য্য! আর তখন মোটা, শক্ত, ভারী, ঘন, কাল, পুরু জিনিষ পছন্দ হয় না। মিহি পুরাণ চালের ভাত, সোণা মুগের দাল ক্ষুদ্র মাছের ছোল পাতলা রুটি, দুধ লঘু জল খাবার, ধবধবে ময়দা, সাদা চিনি, হাওয়ার ধুতি, রেশমী চাদর, ফিন ফিনে কামিজ, হাল্কা ছাতা শোলা টুপী, সরু ছড়ি, জড়ির জুতা, নরম বিছানা, হাল্কা আমোদ, হাল্কা উপন্যাস, গল্প সাহিত্য প্রভৃতি দুর্ব্বল বাবুর ভাল লাগে। কেবল মিহি, কেবল সরু, কেবল সাদা, কেবল পাত্লা, কেবল নরম, কেবল হাল্কা, লঘু!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত লঘু ও নরম খাওয়া পরাতেও আমাদের মেজাজটা হয় গরম। বিশেষতঃ যাহাই বলুন, সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা হইতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস:—দারিদ্র্যপীড়িত গরম দেশে ঔদ্ধত্য বিকাশিনী গরম শিক্ষা হওয়ায়, ঠাণ্ডা কোমল ধর্ম্মনীতি পূর্ণ পবিত্র উপদেশ না পাওয়ায়, পথে, মাঠে, ঘাটে, রেলগাড়ী, ষ্টীমারে সদা সর্ব্বত্র গরম চা, কাফি, কোকো, পাঁউরুটি, বিস্কুট, পেঁয়াজবড়া, আলুর চপ প্রভৃতি ভারতের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভেজাল অখাদ্য—কুখাদ্য খাওয়ায়, প্রায় অষ্ট প্রহর পান, বিড়ি, তামাক, নস্য, সিগারেট, জরদার শ্রাদ্ধ করায়, নাকে মুখে চোখে চারটী অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল ভাত গুঁজিয়া ভরাপেটে দুপুর রৌদ্রে আপিষের পোষাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্রুত পদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কার্য্যালয়ে যাওয়ায়, সামান্য অর্থের জন্য স্বাধীনতার বিনিময়ে পরের দাসত্ব করিয়া, শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভিতর দিয়া কালক্ষ্যাসানে স্ত্রীপুত্র কন্যাদির ভরণ পোষণের আয়ুঃক্ষয় করী দুশ্চিন্তায় এবং সারাদিনের অনিয়মে উত্তপ্ত দেহে অত্যধিক রতি বিলাস করায় আমাদের শরীর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে পায় না,—কামারের হাপরের ন্যায় দেহ মন সর্ব্বদাই গরম আগুন হইয়া থাকে। অবশ্য এ মন্তব্য গুলি সাধারণতঃ গরীব ও মধ্যবিত্ত মসীজিবী গৃহস্থ বিষয়েই সবিশেষ প্রয়োজ্য।

সহরে বাবুদিগের খোরাক দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। মুণকে রঘুনাথ বা আশানন্দ ঢেঁকির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আধুনিক সময়েও যে পরিমাণ আহার করা উচিত, তাহাই বা করিতে দেখি কই? বাবুর বাড়ীতে খাইতে বসিয়া সম্মুখে থালায় চারিটী ধব ধবে বালাম চালের ভাত দেখিলে মনে হয়—এ নস্যটুকু কোথায় দিব, মুখবিবরে না নাসিকারন্ধ্রে? পল্লীগ্রামে প্রথম প্রথম জামাই—শ্বশুর বাড়ী আসিলে ছোট সম্বন্ধীরা এই মুষ্টিমেয় অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়া নূতন জামাতাকে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে। কতকগুলি

বেশী খাওয়াও আবার সহরে কায়দাকানুনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এজন্ত সহরে পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোকের বড়ই মুস্কিল হয়; লোকলজ্জা পুনরায় সহিতেও পারেন না, আবার ক্ষুধা শান্ত না হইলে পেটও জলিতে থাকে। দুই-ই বালাই। উঃ! কি কঠোর বাহ্য নিয়মানুশাসিত কেতা-দুরস্ত অন্তঃসার শূন্য নাগরিক সভ্যতা! পল্লীর কৃষকদের খাওয়া দেখিলে বাবুরা হয়ত গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া যান।

অবাক্ হইবারই ত কথা। রশুনের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যেমন অতি নিভৃত অন্দরে একটু শাঁস পাওয়া যায়, তেমনি সহরের নবাবিষ্কৃত, গলি গলি ফেরিওয়ালাদের কাছে গরম গরম প্রাপ্তব্য, পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বস্তু নিচয়ের মধ্যে অন্ততম 'অবাক্ জলপানে'র ঠোঙ্গা খুলিতে খুলিতে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায়, তখন সহরে পয়সা রোজগারের ফিকির দেখিয়া সত্যসত্যই অবাক্ হইতে হয়। পাড়াগেঁয়ে মান্ধাতার আমলের চালছোলামটর ভাজা সহরে গিয়া খুনো ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া শত ভাজ কাগজের আবরণের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া মামুলী নাম বদলাইয়া অবাক্ জলপান' হইয়াছেন। বলিহারি আবিষ্কারকের মাথা। তাঁহার চাতুরীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

যাহা হউক যাঁহারা 'অবাক্ জলপানে' কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নির্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া থাকেন, তাঁহারা গ্রাম্যকৃষকের গুড়মুড়ি জলখাবার দেখিয়া যে মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হয়েন না, ইহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য। বস্তুতঃ এক একজন কৃষাণ যে পরিমিত গুড়মুড়ি খায় তাহা বোধ হয় চারিজন সহুরে বাবু একবারে চিবাইয়া শেষ করিতে পারেন না। আমন ধানের ভাত পছন্দ করে না কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলে—"মশাই, দুপুর রোদে মাঠে লাঙ্গল ঠেলা কাজ যদি করিতেন, তাহা হইলে জানিতেন, ক্ষুধা কি বস্তু। 'পেটে যেন রাক্ষস ঢুকিয়াছে' এই চলিত কথা আমাদের প্রতিই ঠিক খাটে। আমন ধানের ভাত খাইলে দুইবার প্রস্রাবের পরই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। আমরা গরীব শ্রমজীবী, এত ঘন ঘন খাবার পাই কোথা? কাজেই মোটা মোটা আউশ চালের ভাত একপেট খাইয়া মহাজনী নৌকা বোঝাই করিয়া দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া ক্ষেতে-খামারে ভূতের মত পরিশ্রম করি"। কঠোর অঙ্গ চালনায় শ্রমিক পাথর হজম করিয়া ফেলে, আর মাংসপেশীর সমুচিত সঞ্চালন অভাবে আমরা একটু বেশী জলখাও ও পরিপাক করিতে পারি না। ইহা কি আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয়? ইহা কি দেশের মঙ্গলকামী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিবার কথা নয়? যেরূপ লঘু আহার দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আমরা ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্ম বায়ুভুক্ হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় বৎসরে কিয়দংশ কাটাইব না কি? 'নব্যদলের লঘুগুরু জ্ঞান নাই'—প্রাচীনদিগের এই উক্তির আংশিক সত্যতা স্বীকার করিতে পারি; আমাদের গুরু নাই, গোঁসাই নাই, গুরুজ্ঞান নাই, গুরুভক্তি নাই, গুরুপুরোহিত পদে মতি নাই, আমাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ধর্ম্মে আস্থা নাই, পরকালে বিশ্বাস নাই, তাই আমরা কর্ণহীন অর্ণবপোতের ন্যায় জীবন-

স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি—এ সব দোষারোপ বিনা আপত্তিতে শিরোধার্য্য। কিন্তু লঘুবোধ আমাদের বিলক্ষণ আছে। গুরুর কাছেও আমরা ঘেঁসি না, কিন্তু লঘু আমাদের বড় প্রিয়। আমাদের লঘুচিত্ত, লঘুবিত্ত, লঘুপথ্য, লঘুব্যায়াম, লঘুসাহিত্য, লঘুব্যাকরণ, লঘু ইতিহাস, লঘু আমোদ প্রভৃতি সবই লঘু। কেবল দুই একটী গুরুতম ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, সেটী আমাদের স্বল্পাহার অভ্যস্ত ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে মধ্যে গুরুভোজন ও গুরুবিহার বা অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণতা।

পূর্ব্বে বহু আহারে অল্পমূত্র হইত, এখন অল্পাহারে বহুমূত্র—ঠিক বিপরীত। অত্যধিক মানসিক ব্যায়াম, স্নায়বিক অবসাদ, রাত্রি জাগরণ, কুভোজন ও অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবায় চাকুরী জীবিদিগের মধ্যে বিশেষতঃ যাঁহারা কেবল এক স্থানে বসিয়া কঠিন মস্তিষ্ক চালনা করেন, অথচ সেই অনুপাতে মুক্তবায়ুতে অঙ্গচালনা ও পরিমিত বিশুদ্ধ পান ভোজন করেন না, তাঁহাদিগের যৌবনের শেষভাগে রক্তের জোর একটু কমিলেই এই মারাত্মক ব্যাধি দেখা দেয়। ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে যে কত বিচারক, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, অধ্যাপক কেরাণী, পোষ্টমাষ্টার, রঙ্গালয়ের অভিনেতা, সুবক্তা, রায় সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি দেশের মুখোজ্জ্বলকর সুসন্তান এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা কে নির্ণয় করিবে? গ্রীষ্ম মণ্ডলে ঠিক দুপুর বেলা ভরাপেটে আপিষের পোষাকে চেয়ারে বসিয়া কলম চালান যে কি কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। বাহিরের লোকে মনে করে—বেশ বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিড়ি চুরুটের ধূম টানিতে টানিতে লেখাপড়ার কাজ করায় এমন কি ক্ষতি হয়? ব্যথার ব্যথী ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে। চাকুরে বাবুর টাকের উপর অনেক সময় জোরে বিজলী ব্যজনের হাওয়া লাগায় মাথার চাঁদি গরম হইয়া উঠে। এখন সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল লাগে। ফল কথা, মূত্ররোগ শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিয়া যে কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন।

বাবুদের ব্যারাম যেন অঙ্গের আভরণ। 'বাবু' বলিলেই যেন কতকগুলি রোগের ডিপো বুঝিতে হইবে। একটু অর্শ, একটু বহুমূত্র, একটু অম্লবৃদ্ধি, একটু কুরণ্ড, একটু মেহ ও মেহাশ্রিত জ্বর, একটু বাত, একটু কাশ, একটু দৃষ্টিশক্তি হীনতা প্রভৃতি রোগ বাবুর দেহকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শরীরটীকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তুলিয়াছে। বাবুর রোগ প্রতিষেধক শক্তিও দিন দিন কমিতেছে, তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল চিররোগী হইয়া পড়িতেছেন। যেমন কতকগুলি ভূত ব্যক্তি বিশেষে অধিকার করিতে ভালবাসে সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধি, ননীর পুতুল বাঙ্গালী বাবুর কুসুমপেলব রমণীমোহন দেহটীকে বড়ই পছন্দ করে।

শ্রমবিমুখ বড় লোকের ব্যারাম শ্রমশীল গরীবলোকের মধ্যে বড় বেশী দেখা যায় না। ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে, যেহেতু কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ হইলে সে

বেচারী আর বাঁচে কিসে? যাহারা মাঠে লাঙ্গল ঠেলিয়া কাঠ কাটিয়া, করাত টানিয়া, বোঝা বহিয়া, ইট গাঁথিয়া, লৌহ পিত্তল পিটাইয়া, কাদা ছানিয়া, নৌকা বাহিয়া, মাছ ধরিয়া, কাপড় কাচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা, অম্লোদ্গার ও বদহজমের তোয়াক্কা রাখে না। তাহারা রসের নাগর বা ভাবের সাগর নয়; তাহারা মোটামুটি—সোজাসুজি—সুস্থ সবল লোক,—গায়ের জোরে দক্ষিণহস্তের ব্যাপার যোগাড় করিয়া জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কথার বাণিজ্যে হাজার হাজার শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিতে জানে না; তাহারা গাড়ী গাড়ী কবিতা লিখিয়া ভাবের বন্যায় ভুলিয়া প্লাবিত করিতে শিখে নাই; তাহাদিগের কাব্যসাগরে সুদক্ষ ডুবারী নামাইয়া কবির অতলস্পর্শ নিগূঢ় মনের ভাব বুঝিতে হয় না। তবে কর্ম্মী হিসাবে তাহারাও বড় কম নয়। ঝড়তুফান, বৃষ্টি বাদল, শীতগ্রীষ্ম, ঘৃণা-বিদ্রূপ প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ ক্লেশের পসরা মাথায় লইয়া এই অসভ্য চাষারাই, সুসভ্য দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের অশনবসনাদি সুখসমৃদ্ধির মাল মশলা যোগাইতেছে। ইহারা সখের রোগের ধার ধারেনা। দরিদ্র শ্রমিকদিগের পাক যন্ত্র ঘটিত অজীর্ণ অম্লপিত্ত কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি ব্যারাম খুব কম। তাহারা প্রায়ই মরে ফৌজদারী অসুখে, কারণ তাহাদের শিক্ষা, সংযম ও বিচার শক্তি নাই। গ্রামে হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। ঠাণ্ডায় গলার বীচি ফুলিয়া উঠিয়াছে, কোন খেয়াল নাই। পূর্ব্ববৎ ঘরের বাহিরে শুইয়া থাকে। পাড়ায় কলেরা আসিয়াছে, তবুও ভয় নাই। প্রকাণ্ড একটা ইলিস মাছ খাইয়া সেই রাত্রিতেই ওলাদেবীর অঙ্ক আরোহণ করে; কিম্বা অস্থানে কুস্থানে গমন করতঃ কুঁচকি, বাঘি, মেহ, উপদংশ প্রভৃতি কুৎসিৎ ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

ভগবান্ এখনও এত নিষ্ঠুর হন নাই—নড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া কি পৌরুষ হইবে? পল্লীগ্রাম ত মৃতপ্রায়, কাটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপ করিয়া কি লাভ হইবে? পাঁড়াগাঁয়ে বিস্তর গরীব লোক দেওয়ানী-ম্যালেরিয়ার জর্জ্জরিত হইয়া তিল তিল করিয়া প্রতি নিয়ত মরিতেছে, ইহাদের রোগ প্রতিষেধক শক্তি যথেষ্ট আছে, সেজন্য ম্যালেরিয়া সহজে তাহাদিগকে পাড়িয়া উঠে না। এ যেন রাম-তাড়কার যুদ্ধ—কেহ কাহাকেও সুবিধামত বাগে পাইতেছে না। কিন্তু একবার জ্বর ভাল করিয়া সাপটিয়া ধরিলেই ইহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে; কারণ ইহাদের শিক্ষা নাই, নিয়ম পালন নাই; সুপথ্য নাই, গরম কাপড় চোপড় নাই আর সর্ব্বোপরি ভীষণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই আমাদের মাথা খাইয়াছে। যেখানে দুঃখ-দৈন্য অভাব, সেই খানেই রোগ, শোক, কলহ ও অকাল মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করাল মূর্ত্তি যতদিন সুস্থ ও সবল দেহে গতর খাটাইয়া জীবন যাপন করে, ততদিন তাহাদের মাথাটী পর্য্যন্ত ধরেনা। খেও খুঁটি পর্ব্বত। কিন্তু খুঁটি একটু হেলিলেই সর্ব্বনাশ! গতর পড়িয়া গেলেই আর তাহারা উঠিতে পারেনা; কারণ তাহারা যে বড় গরীব, এক আধ মাস বিছানায়

পড়িয়া থাকিলে খাইবে কি ? তাহারা একে কাঙ্গাল, তাহার উপর অমিতব্যয়ী ভবিষ্যতে দুর্দ্দিনের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে জানে না। যে দেহ খাটাইয়া রোজগার করিবে, সেই দেহ রোগাক্রান্ত হইলেই তাহাদের বাঁচা দুর্ঘট। তাহাদের পুঁজি মূলধন মাত্র শরীর, সুতরাং শরীর শয্যাগত হইলেই তাহাদের দফারফা হইল।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ যে মস্তিষ্কপরিচালকের মধ্যে প্রবল ভাবে চলিতেছে একথা কোনমতেই অস্বাকার্য্য নহে। মগজের খাটুনি যাঁহাদিগের ব্যবসায়, কায়িকশ্রমের প্রতি তাঁহাদের প্রবৃত্তিও হয়না. বেশী অবসরও পান না। যাঁহারা মুক্তবায়ুতে দ্রুতপদে ভ্রমণ বা স্বহস্তে কিছু ২ গৃহকর্ম্ম সম্পাদনকে মান-হানিকর অতি নীচ ও জঘন্য কাজ বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই মেদ, মূত্র, মেহাদি রোগের প্রাবল্য। তাঁহাদিগের মাথা ও মাংস আছে—হৃদয় ও স্বাস্থ্য নাই। তাঁহাদের মাথার প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয়। তাঁহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্ব্ব বিষয়ে সকল দেশের ছাত্রকে হারাইয়া প্রথমস্থান অধিকার করিতে পারেন; তাঁহারা ঘরে বসিয়া অতিকূট প্রশ্নের মীমাংসা বা মামলামোকদ্দমার চাল বলিয়া দিতে পারেন; কেবল মধ্যে মধ্যে চা-হালুয়া-পান-তামাকু-বিড়ি-চুরুট সেবন করিয়া সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তদিনই তাস পাশাদাবা খেলায় অতিবাহিত করিতে পারেন; রেলপথের জটিলসময় ও শুল্ক তালিকা অনায়াসে সুচারুরূপে প্রস্তুত করিতে পারেন; গণপতির ন্যায় কলম চালাইয়া দিস্তাদিস্তা কাগজে সুদীর্ঘ রায় লিখিতে পারেন; বিগত পঁচিশ বৎসরের সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব, আবশ্যক হইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পুরাতন কাগজপত্র সেরেস্তা হাতড়াইয়া অতি পরিপাটী এক বিবরণী দাখিল করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের নিজের দেহ নিজের নয়; গৃহচিকিৎসকের উপর প্রাণ সঁপিয়া পড়িয়া আছেন। একটু আমড়াপোস্ত খাইবার বাসনা হইলেও ডাক্তার বাবুর উপদেশ চাই—কি জানি যদি অসুখ হয়। দেহ যদি স্ববশে থাকিত, তাহা হইলে বাটীর বাহিরে যাইতে হইলেই কি কোন-না কোন যানের প্রয়োজন হইত ? তাঁহারা পরের পায়ে হাঁটেন, পরের মুখে খান। জুড়িগাড়ীতে দুইক্রোশ বেড়াইয়া হাওয়া খাইয়া আসিলেন, কিন্তু অঙ্গচালনা হইল কাহার—তাঁহার, না তাঁহার ঘোটকের ? সাধের আমবাগানে গাছের গায়ে টিকিট আঁটিয়া কেতাবে ফলের রং, আকার আস্বাদ প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছেন (কারণ কায়দার ত্রুটি হইলে ত চলিবেনা) কিন্তু বাবু আর কয়টা আমের সুতার পান ? ল্যাংড়া বোম্বাই খাইতেছে তাঁহার সৌভাগ্যশালী-হৃষ্টপুষ্ট আমলা চাকর।

সুখে মানুষকে সুকুমার জড়ভরত করিয়া ফেলে; দুঃখে লোক বলবান্ সাহসী, শ্রমশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়। দুঃখের হাপরে ফেলিয়া ভগবান্ মানুষকে উত্তমরূপে পোড়াইয়া পিটাইয়া জীবনসংগ্রামের উপযোগী করিয়া দেন। পর্ব্বতসমাকীর্ণ শীতপ্রধান দেশের মানুষ কেমন দৃঢ়কায় উদ্যমশীলও কর্ম্মঠ; আর সমতলবাসী মৃদুমন্দমলয়ানিলসেবী আরামপ্রিয়া বিলাসী ভাবপ্রবণ নরনারীর দেহও যেমন নবনীতকোমল শিথিল মাংসপিণ্ড, মনও

তেমনি ভীরুকাপুরুষের ন্যায় ক্ষীণ দুর্ব্বল ও দাঢ্যহীন। বহুসংখ্যক মূত্ররোগীর অবস্থা হইতে দেখা যায় যে, তাঁহারা দারিদ্র্যদুঃখের সময়ে বেশ শক্তসামর্থ ছিলেন; অনায়াসে দুই ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন; পরিপাকশক্তি প্রবল ছিল—এক থাল ভাত ব্যঞ্জন খাইয়া হজম করিতে পারিতেন; দেহ তখন মাংসমেদ-বহুল স্থূল ছিলনা, কাজেও যখন তখন স্বাধীনও ব্যবহার্য্য ছিল। কিন্তু অত্যধিক মাথার খাটুনি, অমিতাচার ও শারীরিক ব্যায়ামের অভাবের ফলে দেহ যেন বন্যারজলে অল্পে ২ ফাঁপিয়া উঠিল। যিনি যৌবনকালে কেমন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও খেতাব বৃদ্ধির সঙ্গে ২ দেহও যেন হঠাৎ বসাবাহুল স্থূল হইয়া পড়িল। সুখের দশা যেই হইল, অমনি অজীর্ণ, অম্লাপত্ত, অর্শ, কুরণ্ড, বহুমূত্র, বাত, প্রভৃতি রোগের একটা না একটা দেখা দিল। আর্থিক উন্নতির সাহত ধনের নিত্য সহচর মাংস, মেদ ও জড়তা আসিয়া উপস্থিত। আর গাড়ী না হইলে একপোয়া পথও চলিতে পারেননা; দেহের ভারে সর্ব্বদাই হাঁপাইতেছেন, বাড় ২ ঔষধ চলিতেছে। এককথায়, তিনি এখন সম্পূর্ণ পরাধীন-গোঁপখেজুরে সেবাদাস হইয়া পড়িয়াছেন। আহারে রুচি নাই, অথচ মাংসমেদ কমেনা। জলাশয়ে স্নান করিতে গিয়া হয়ত দেহের খাঁজের মধ্যে কি একটা পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে; বাবুর তখন কোন খেয়ালই হয় নাই। পূর্ব্ববৎ কাজ কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু শরীরের সেই দিকে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ হয় ও নাকে অনুক্ষণ একটা দুর্গন্ধ আসিয়া লাগে। ক্রমে যন্ত্রণায় অস্থির হইলে একজন বত্রিশটাকা ভিজিটের নামজাদা ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা সর্ব্বশরীর পরীক্ষাপূর্ব্বক শেষে শিক্ষালব্ধ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে গায়ে হাতদিয়া টিপিতে ২ মাংসের খাঁজ হইতে একটা প্রকাণ্ড পচা গল্দাচিঙ্গড়ি মাছ বাহির করিয়া বাবুর জীবন রক্ষা করিলেন; লোকে ও চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' রবে ডাক্তার বাবুর সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। হা ভগবন্! তোমার কি অবিচার!! কেহ একটু মাংসের জন্য লালায়িত—কত অর্থব্যয় করতঃ সালসা খাইতেছে; আবার কেহ মাংসের বোঝায় অস্থির, ব্যতিব্যস্ত কিসে চর্ব্বি কমে এইজন্য মহা ব্যাকুল। এই সব স্থূলকায় পরবশ মৈনাক পাহাড়ের ন্যায় বিরাট বাবুদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা হয় না—এটা সুখ, না দুঃখ? যে সুখে জীবন অসহনীয় করিয়া তুলে; যে সুখে নিজের দেহভার বহিতে বহিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; যে সুখে মানব, স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া এরূপ শ্রমকুণ্ঠ, পরাধীন, ঔষধ—মাদুলীগত প্রাণ হইয়া পড়ে, সেটা সুখ, না দুঃখের পরাকাষ্ঠা? তাই মনে হয়—"আগে,জেলে ছিল ভাল জাল দড়ি বুনে, কি কাল করিল সে যে এঁড়ে গোরু কিনে॥" আর একটী উদাহরণ বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সজীব স্ফূর্ত্তিময় চটুল ছাগশিশু ও গোবৎসগণ কেমন আনন্দে নেচে কুঁদে বেড়ায়। বীজ পাঁটা গুলিও সারাদিন চতুর্দ্দিকে চলাফেরা করে। কিন্তু ম্রিয়মাণ খাসিগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করিবেন কি দুর্ব্বিষহ যাতনায় উহারা জীবন ধারণ করিতেছে! মেদের ভারে বেশী নড়াচড়া করিতে ভালবাসে না। প্রাতঃকালে ছাড়িয়া দিলে

বাটীর বাহিরে আসিয়া দুই চারিটা পা তায় মুখ দিয়াই ক্লান্ত দেহে ছায়ায় বা চাঁদনি রোয়াক বারাণ্ডা উঠানের এক কোণে শুইয়া ঝিমাইতেছে। এরূপ মানুষের মধ্যেও যাহারা অত্যন্ত মেদ—বসা বহুল স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সেই জন্য বোধ হয় চলিত ভাষায় মেদা লোক বলে।

স্বাস্থ্য কেবল মাংসের বস্তা নয়—বল, বিক্রম, তেজ ও উদ্যম। মরাঠাকুলতিলক শিবাজী কি খুব লম্বোদর ছিলেন? অক্লান্ত কর্ম্মী আওরঙ্গজেব শুধু মাংসপিণ্ড হইলে কি শেষ জীবন রণক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে অতিবাহিত করিতে পারিতেন? আত্মসংযম ও মিতাচারে তাঁহার দেহকে সুশিক্ষিত ঘোটকের ন্যায় বাধ্য ও আজ্ঞাবহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মন্‌সওয়ার যখন যাহা বলিবে, যেদিকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিবে, দেহবাজী দ্বিরুক্তি বা কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সং আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে; ইহাই স্বাস্থ্য—ইহাই মানসিক ও দৈহিক বলবীর্য্য। নিজের দেহকে যদি শাসন করিতে না পারে, তাহা হইলে মানব কেমন করিয়া রাজ্যশাসন করিবে। এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া একদা রুস সম্রাট্ পিটার দি গ্রেট বলিয়াছিলেন—I wish to reform my empire, and I cannot reforms myself. মহাত্মা শিবাজীর জীবনে এমন অনেকদিন কাটিয়াছে—যখন তাঁহাকে কেবল শুধু চণক ভক্ষণ করিয়া বিজন কাননে উষর মরুভূমে ও দুর্গম গিরিগাত্রে অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। রাজপুত কেশরী মহাবীর রাণাপ্রতাপ যদি ননীগোপাল বা মিছরীবাবুর ন্যায় সুকুমার হইতেন, তাহা হইলে কি প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিতেন? নিজের দেহ 'যাহাদের নিজের বশীভূত নয়', তাহাদের উচ্চাভিলাষের ভিত্তি কোথায় জানিনা। পল্লী উদ্ধার বল, দেশ উদ্ধার বল, জাতীয় উন্নতি বল, সকল প্রকার উন্নতি উৎকর্ষের মূল—আত্মোৎকর্ষ, আত্মোন্নতি আত্মোদ্ধার।

(ক্রমশঃ)

---

# রাবণকৃত নাড়ীপরীক্ষা।

[ কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ ]

( পূর্ব্বপ্রকাশের পর )

——:০:——

( বঙ্গানুবাদ )

স্নিগ্ধ রসবতী প্রোক্তা রসোমূর্চ্ছাবিধায়িনী।
ভাবিরোগ প্রবোধায় স্বস্থে নাড়ীপরীক্ষণম্ ॥৩০॥

রসস্থ অবস্থায় নাড়ী যদি রসযুক্তা ও স্নিগ্ধা বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাতে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা আছে-জানিবে। ভাবিরোগ পরীক্ষার

জন্ম স্বস্থ অবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করিবে। ৩০

ভারপ্রদাহমূর্চ্ছাভয়শোকবিসূচিকাভবানাড়ী।
সং মূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতঃ
ভজতে ॥৩১॥

ভারবহন, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা, ভয়, শোক অথবা বিসূচিকা রোগে বিশেষরূপে সংমূর্চ্ছিত নাড়ীও পুনরায় জীবিত অবস্থাকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ ভারবহনাদি দ্বারা শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলে নাড়ী অবসন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবনের কিছু মাত্র হানি হয় না। তত্তৎ অবস্থা জনিত শারীরিক বিকৃতি কাটিয়া গেলেই আবার নাড়ীও দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। এবং বিসূচিকা রোগে নাড়ী অবসন্ন হইয়াও যদি উহা স্বস্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাদৃশ রোগীরও পরিবর্ত্তনের আশা করা যায় ৷৩১

মেহেহর্শসি মলাজীর্ণে শীঘ্রংতুস্পন্দতেধরা ॥৩২॥

মেহরোগে, অর্শোরোগে ও অজীর্ণ জন্য মল ভেদে নাড়ী শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয় ।৩২

গুর্ব্বীং বাতবহাংনাড়ীং গর্ভেণসহ লক্ষয়েৎ।
সেব পিত্তবহা লঘ্বী নষ্টগর্ভাং বদেষ্টতাম্ ॥৩৩॥

গর্ভিণীর নাড়ী বাতবহা (বায়ুর জন্য চাঞ্চল্যযুক্তা) ও (ভার ভার) বোধ হয়। সেই নাড়ী যদি পিত্তবহা ও লঘু বলিয়া মনে হয়। তবে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ৩৩

পিত্তবায়োস্তত্রবাচ্যা লঘুতা গৌরবেণ চ।
আমপক্কবিভাগশ্চ দিনমাসাদিকংবুধৈঃ ॥৩৪॥

পণ্ডিতগণ পিত্ত ও বায়ুর গৌরব ও লঘুতা দেখিয়া দোষের আমও পক্কের বিভাগ এবং রোগের দিন এবং মাসাদি বলিয়া দিবেন ।৩৪

দোষ্পীড়া বক্রিমত্বেচ প্রহারে ত্রসনেনচ।
ব্যায়ামেহট্টাট্টহাসে চ নৈতিস্ফুরণতাং ধরা ॥৩৫॥

বাহুর পীড়া বা বক্রতাদ্বারা এবং প্রহার, ত্রাস, ব্যায়াম ও অট্টহাস্য প্রভৃতি দ্বারা নাড়ীর গতি সম্যক প্রকারে স্ফুরিত হয় না ॥৩৫

গম্ভীরা বা ভবেন্নাড়ী সা ভবেন্মাংসবাহিনী ॥৩৬॥

যে নাড়ীর গম্ভীর ভাবে বহিয়া যায় তাহাকে মাংসবাহিনী বলিয়া থাকে ।৩৬

দীর্ঘা, কৃশা বাতগতির্বিষমা বেপতে ধরা।
জীবঘ্নী বাহসমৈশ্চিহ্নৈর্ব্যাকুলাহজীর্ণসঞ্চয়া ॥৩৭॥

নাড়ী যদি দীর্ঘাকৃশা ও বায়ুর গতি সম্পন্না হইয়া বিষম ভাবে কম্পিত হইতে থাকে অথবা বহুদিন অজীর্ণ রোগ ভোগ করিয়া কাতর নাড়ী অসম চিহ্ন সকলের দ্বারা কম্পিত হইতে থাকে তবে তাহাকে প্রাণহারিণী বলিয়া জানিবে ॥৩৭

শীতার্দ্দিতস্য গাত্রস্য চিরাত্মশ্লথ মন্থরা।
শয়ানস্য বলোপেতা নাড়ী স্ফুরণভুগ্বহা ॥৩৮॥

সমস্ত গাত্র শীতল হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির নাড়ী যদি বহুক্ষণ পরে সূক্ষ্ম ও অতি ধীর ভাবে বহিতে থাকে এবং (উত্থান শক্তি রহিত) শয্যাগত রোগীর নাড়ী যদি বলবতী হয়, তাহা হইলে নাড়ীর উভয়বিধ অবস্থাকেই প্রাণঘাতিনী বলিয়া জানিবে ।৩৮

কিঞ্চিদাভুগ্নগতিকা স্বস্থা নির্বহতে ধ্রুবম্।
সূক্ষ্মরূপা স্ফুটা শীতা স্বস্থানস্থে কফে তথা ॥৩৯॥

কফ স্বস্থান গত হইলে, নাড়ীর গতি ঈষৎ বক্র হইলে সুস্থভাবেই বহিয়া থাকে। এবং নাড়ীর ভার সূক্ষ্ম হইলেও পরিস্ফুট এবং শীতল হইয়া থাকে।৩৯।

পিত্তে স্বস্থানগে তদ্বৎপ্রবলা সরলা চলা।
অনৃজুর্বাত কোপেন চণ্ড পিত্তপ্রকোপতঃ ॥৪০॥

পিত্ত স্বস্থান গত হইলে নাড়ীর গতি প্রবল সরল ও চঞ্চল হইবে। (তাদৃশ অবস্থায়) বায়ুর কোপ হইলে নাড়ীর গতি বক্র এবং পিত্তের প্রকোপে নাড়ীর গতি প্রখর হয় ।৪০।

সরলা শ্লেষ্মকোপেন নাড়ী দোষৈঃ পৃথক্ স্মৃতা।
কফে হীনেঽধিকং বাতগতিং বহতিনাড়িকা ॥৪১॥

শ্লেষ্ম প্রকোপে নাড়ী সরল হয়। দোষ সকলের দ্বারাই নাড়ী পৃথকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। (যেমন বাতকোপে নাড়ী কুটিলা, পিত্তকোপে প্রখরা এবং শ্লেষ্মকোপে সরলা)—ইত্যাদি) নাড়ীতে কফের হীনতা ঘটিলে নাড়ী অধিক পরিমাণে বায়ুর গতি প্রাপ্ত হইয়া বহিতে থাকে ।৪১।

হীনে বাতে কফে চাতিস্বল্পে পিত্তে চিরাৎস্ফুটা।
সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরামন্দা নাড়ী সহজবাতজা ॥৪২॥
বক্রাচ শেষচ্চপলা কঠিনা বাতপিত্তজা।
স্থূলা চ চঞ্চলা শীতা মন্দাস্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা ॥৪৩॥
সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্ম সমুদ্ভবা।
পিত্তাধিক্যে চ চপলা কটুকাদেশ্চ ভক্ষণাৎ ॥৪৪॥

বায়ুর ও কফের হীনতা ঘটিলে এবং পিত্ত অতি স্বল্প হইলে নাড়ীর গতি শান্ত, সূক্ষ্ম, চাঞ্চল্য শূন্য ও মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে থাকে এবং কখন কখন পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বায়ু সহজ অবস্থায় থাকিলে নাড়ী বক্রা এবং বায়ুও পিত্তে নাড়ী ঈষৎ চঞ্চল ও কঠিন হইয়া থাকে। শ্লেষ্ম ও বায়ুতে নাড়ীর স্থূল চঞ্চল শীতল এবং বেগশালী হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মাতে নাড়ীর সূক্ষ্ম শীতল ও বেগবতী হয়। পিত্তের আধিক্যে এবং কটু দ্রব্যের ভোজনে নাড়ী চঞ্চল হইয়া থাকে ।৪২—৪৪॥

নিরন্তরং খরং সূক্ষ্মমন্নমশ্নাতি বাতলম্।
রুক্ষাজাতোগুণ তস্য নাড়ী স্যাৎ
পিত্তসন্নিভা ॥৪৫॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর রুক্ষ ও সূক্ষ্ম বাতবৃদ্ধিকর অন্নাদি দ্রব্য ভোজন করে তাহার নাড়ী ও রুক্ষ এবং বাত প্রধান ও পিত্ত সান্নভা হইয়া হইয়া থাকে ।৪৫।

নাড়ীতন্তু সমা মন্দা শীতলা সর্ব্ব দোষজা।
রিরংসোরুষ্মিতরতে রতস্যাপি চ বাতবৎ ॥৪৬॥

সর্ব্বদোষে নাড়ী তন্তু সদৃশ মন্দ বেগও শীতল হইয়া থাকে,রমন অবস্থায় তাহার পূর্ব্বে ও পরে নাড়ীতে বায়ুর গতি লক্ষিত হয় ।৪৬।

রুদ্ধবেগস্য বালস্য শল্য বিদ্ধস্য পিত্তবৎ।
নিদ্রালোর্মে দুরস্যাপি কফবর্ত্তৃপ্তদৃপ্তয়োঃ ॥৪৭॥

মলমূত্রাদির বেগরোধকারীর, বালকের,শল্য বিদ্ধব্যক্তির এবং তৃপ্ত ও দৃপ্তব্যক্তির নাড়ীর গতি পিত্তের স্থায় এবং নিদ্রাশীল ও স্থূল দেহী ব্যক্তির নাড়ীর গতি কফের তুল্য হইয়া থাকে ।৪৭।

সমাসূক্ষ্মা হ্রস্বস্পন্দা মলাজীর্ণে প্রকীর্ত্তিতা।
বিষমা কঠিনা স্থূলা মলশেষাৎপ্রকীর্ত্তিতা ॥৪৮॥

মলের অজীর্ণতাবশতঃ নাড়ীর গতি সমা সূক্ষ্ম ও ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে থাকে এবং মল শেষে নাড়ী বিষম, কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে ॥৪৮।

রক্তাদজীর্ণাদ্বমনম্বিরেকা দ্বীজক্ষয়াদ্রক্তস্রুতে নিবন্ধাৎ।
সংমূর্চ্ছনাদ্বৈজঠরাগ্নিমান্দ্যান্নাড়ীবহেতন্তু চলাচ জন্তোঃ ॥৪৯॥

রক্ত ক্ষয়, অজীর্ণ, বমন, বিরেচন, বীর্য্যক্ষয় রক্তস্রাব, নিবন্ধন এবং মূর্চ্ছাদি ও জঠরাগ্নির মন্দতা বশতঃ রোগীর নাড়ী —তন্তু সদৃশ ক্ষীণও চঞ্চল হইয়া থাকে ।৪৯

নিরামা সূক্ষ্মগা জ্ঞেয়া কফেনাপরিপূরিতা।
নাড়ীতন্তুসমা মন্দা শীতলা সর্ব্বদোষনা ॥৫০॥

নিরাম অর্থাৎ রোগের তরুণ অবস্থায় অতীত হইলে নাড়ী সূক্ষ্ম ও কফের দ্বারা অপরিপূরিত বলিয়া মনে হয়। এবং সর্ব্বদোষে নাড়ী তন্তু সদৃশ ক্ষীণ মন্দবেগ ও শীতল হইয়া থাকে ।৫০॥

মন্দং মন্দং মিতাহারে কফপিত্তসমন্বিতা।
বহুদাহকরে রক্তে প্লাবয়ন্তী বিশেষতঃ ॥৫১॥

পরিমিত আহার করিলে কফ পিত্ত সমন্বিতা নাড়ী ধীর ভাবে বহিতে থাকে।

শরীরে রক্তাধিক্য বশতঃ যদি দাস্ত উপস্থিত হয় তাহা হইলে নাড়ী বিশেষ রূপে উচ্ছলিত ভাবে বহিতে থাকে ।৫১

মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি দীর্ঘা পুনর্দ্রুতা।
তদা নূনং মনুষ্যস্ত রুধিরা পূরিতা মলাঃ ॥৫২॥

করের মধ্যভাগে অর্থাৎ নাড়ী দেখিবার সময় মধ্যাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী দীর্ঘ এবং দ্রুত ভাবে বহিতেছে বলিয়া মনে হয়, তবে মনুষ্যের বায়ু, পিত্ত ও কফ রুধির দ্বারা পরিপূরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ বাত পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ যদি রক্তকে আশ্রয় করে তাহা হইলে নাড়ীর গতি বিচ্ছেদ বিরহিত ও প্রবল হইয়া থাকে ।৫২॥

বক্রা চ চপলা শীতস্পর্শা বাতজ্বরে ভবেৎ।
দ্রুতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ ॥৫৩

বায়ুর জন্য জ্বরের নাড়ী বক্রা, চপলা ও শীত স্পর্শা এবং পিত্ত জন্য জ্বরের— নাড়ী দ্রুতা সরলা দীর্ঘ ও শীঘ্রা হইয়া থাকে ।৫৩

মন্দা চ সুস্থিরা শীতা পিচ্ছিলা শ্লেষ্মকে ভবেৎ।
মৃণাল সরলা দীর্ঘা নাড়ী পিত্তজ্বরে বহেৎ ॥৫৪॥

শ্লেষ্ম জন্য জ্বরে—নাড়ী ধীর সুস্থির শীতল পিচ্ছিল হইয়া থাকে এবং পিত্ত জ্বরে নাড়ী মৃণালের ন্যায় সরল ও দীর্ঘ হইয়া বহিতে থাকে ।৫৪

শীঘ্রমাবহতে মন্দং মলাজীর্ণাৎ প্রকীর্ত্তিতা।
স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রং স্পন্দতেঽতীব শান্তরে ॥৫৫॥

মলের অজীর্ণতাবশতঃ নাড়ী মন্দ অথচ শীঘ্র বহিতে থাকে। এবং অত্যন্ত শান্তির (?) জন্য নাড়ী স্থূল, কঠিন ও শীঘ্র স্পন্দিত হইতে থাকে ।৫৫

পুরা মন্দা চ শনকৈশ্চণ্ডতাং যাতি নাড়ীকা।
জরং শৈত্যং বেপথোর্ব্বা সংভবং ব্রূভি
দ্রুতম্ ॥৫৬॥

প্রথমে শান্ত নাড়ীর গতি যদি ক্রমশঃ বেগবতী হইতে থাকে তাহা হইলে শীঘ্রই শীতজ্বর অথবা কম্পজ্বর হইবে বলিয়া জানিবে।৫৬

হয়মৈকাহিকাদীনাং ব্যধীনাং জননী মতা।
ভূতগ্রহে শিরাঽলক্ষ্যা ভাবিন্তৈকাহিকেজ্বরে ॥৫৭

ঐরূপ নাড়ী ঐকাহিক ব্যাধির জননী বলিয়া কথিত হয়, ভূতাবেশ জন্য ঐকাহিক জ্বরে নাড়ীর গতি বড়ই অস্পষ্টা লক্ষিত হয়।৫৭

কদাচিন্মন্দগমনা কদাচিদ্বেগবাহিনা।
দ্বিদোষকোপতো জ্ঞেয়া হন্তি চ স্থানবিচ্যুতা ॥৫৮

কদাচিৎ মন্দ গমনা কদাচিৎ বেগ বাহিনী নাড়ী দ্বিদোষের প্রকোপ জন্য হইয়া থাকে। তাদৃশ নাড়ী যদি স্বস্থান চ্যুত হয় তবে রোগীর জীবনের আশা নাই।৫৮

রক্তপিত্তে বহেন্নাড়ী মন্দাচ কঠিনা ঋজুঃ॥
কাসশ্লেষ্মে স্থিরা মন্দা শ্বাসে তীব্রগতির্ভবেৎ ॥৫৯॥

রক্ত পিত্তের নাড়ী (শিথিল) কঠিন ও সরল ভাবে বহিতে থাকে এবং শ্লেষ্ম জন্য কাশে নাড়ী স্থির ও মন্দ এবং শ্বাসে নাড়ীর গতি তীব্র হইয়া থাকে।৫৯

নাড়ী নাগগতি শ্চৈব রোগপজে প্রকীর্ত্তিতা।
মদাত্যয়ে চ সূক্ষ্মা স্যাৎকঠিনা পরিতো
জড়া ॥৬০॥

রোগরাজ অর্থাৎ রাজযক্ষ্মার নাড়ীর সর্পের ন্যায় গতি হইয়া থাকে ॥৬০॥

অর্শোরোগে স্থিরা মন্দা কচিদ্বক্রা ক্কাচদৃজুঃ
অতিসারে তু মন্দা স্যাৎ হিমকালে
জলোকাবৎ ॥৬১

অর্শোরোগে নাড়ীর গতি স্থির ও মন্দ, এবং কখন বক্র ও কখন সরল হইয়া থাকে। অতিসারে নাড়ীর মন্দ গতি এবং শীতকালে নাড়ী জলোকা বৎ হইয়া থাকে।৬১।

মাংসবৃদ্ধা তু সা ধত্তে জ্বরাতীসারয়োর্গতিম্।
মৃতসর্পসমা নাড়ী—গ্রহণীরোগ মাদি
শেৎ ॥৬২

মাংস বৃদ্ধিতে নাড়ী জ্বর অতিসারের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হয়। এবং মৃত প্রাণ সর্পের ন্যায় গতি বিশিষ্টা নাড়ী দেখিয়া গ্রহণী রোগ নির্দ্দেশ করিবে ॥৬২॥

মূত্রাঘাতে মুহুর্ভেদস্ফুরণে সংপ্লুতা ভবেৎ।
প্রমেহে চ জড়া সূক্ষ্মা মুহু রাপ্যায়তে শিরা ॥৬৩

মূত্রাঘাতে নাড়ী মুহুর্মুহুঃ ভিন্ন ও স্ফুরিত এবং সংপ্লুত হইয়া থাকে। প্রমেহে নাড়ী জড়তা সম্পন্ন। সূক্ষ্ম ও মুহুঃ আপ্যায়িত হইতে থাকে।৬৩

পাণ্ডুরোগে চলা তীব্রা দৃষ্টা দৃষ্টবিহারিণী।
কুষ্ঠে তু কঠিনা নাড়ী স্থিরস্যাদ প্রবৃত্তিকা ॥৬৪

পাণ্ডুরোগে নাড়ী চঞ্চল তীব্রগতি ও তখনই স্পষ্ট আবার তখনই অস্পষ্ট ভাবে বহিতে থাকে এবং কুষ্ঠরোগে নাড়ী কঠিন স্থির ও অপ্রবৃত্তিকা অর্থাৎ অপ্রসন্ন ভাবে বহিতে থাকে।৬৪।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ } পৌষ, ১৩২৯ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

# আয়ুর্ব্বেদের পুরাবৃত্ত।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শরীরি মাত্রেরই প্রয়োজনীয়, এইজন্য প্রাচীনকালেও যে সকল জাতি অতীব অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহারাও তৎকালে এইশাস্ত্র কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইত। যাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জন্য কখন না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। ইতিহাসালোকবর্ত্তী হস্তে করিয়া কালের অন্ধকার পথে যে পর্য্যন্ত গমন করা যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদই প্রাচীনতম। এতদপেক্ষা দূরগত কালে কি ছিল, ভাষা তাহার কিছু পরিচয় দেয় না। আমরা আদৌ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি আর্য্যগণ ঋগ্বেদের সময়ই এই আয়ুর্ব্বিজ্ঞান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

উপাসনাবৃত্তি যেমন মনুষ্যের প্রকৃতিগত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই, বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎপত্তিও তদ্রূপ মানব প্রকৃতির আদি বিকারজনিত। এজন্যই বেদ-কবি বলিয়াছেন, বেদ নিত্য ও আদি পুরুষ ব্রহ্মার কীর্ত্তিত। আবার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আর্য্যগণ ব্রহ্মাকেই আয়ুর্ব্বেদের আদি বক্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ গ্রথিত আছে যে, সত্যযুগে লোক সকল নিরোগী ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষভাগে রোগ সঞ্জাত হয়। অনেক নব্য শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী, হয় তো প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুদ্ধ কল্পনাসম্ভূত ও একেবারে অন্তঃসার শূন্য বলিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু একটুকু প্রীতির সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চয়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ভ্রমেও একথা বলিব না যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে সুস্থ

ছিল, কদাপি কাহাকেও স্বাস্থ্যভঙ্গ জনিত ক্লেশ পাইতে হয় নাই, বরং ইহাই দেখাইব যে, অতীব প্রাচীন ভারত সমাজেও রোগ, শোক বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু কথা এই যে, সত্যে নিরাময়ত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক বাক্য একেবারে তাৎপর্য্য বিহীন নহে। যখন মানব সমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে প্রতিবর্গ ক্রোশে দ্বিসহস্র লোকও ছিলনা, যখন মানবজাতি প্রাচীন বলিয়া জগতে পরিচিত হয় নাই, বাল্য বিবাহ, মদ্যপান ও অপরাপর সভ্যতাসূচক বিলাস সামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বিনিময়ে দৃঢ়তর বল্কল, বাসুশোভন ছত্র-বিনিময়ে বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিয়া আর্য্য ঋষি ক্লান্ত হয়েন নাই, সেই সময়ে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি সাধারণ রকমের কোনো কোনো পীড়া ব্যতীত প্রায়ই রোগ-প্রাচুর্য্য ছিল না। এ স্থলে 'নিরোগ'—এই পদটি রোগহীনত্ব সূচক নহে, নঞর অল্পত্ব অর্থই এ স্থলে প্রযুজ্য।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন সুখও আসিয়াছে, অনেক দুঃখও আসিয়াছে। যে দেশ যত জনাকীর্ণ হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার জ্বালায় জ্বলিয়াছে।

ঋগ্বেদের পূর্ব্বে ও তৎসম কালে যে অল্পে অল্পে আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছিল, বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এইকালে আয়ুর্ব্বেদ একটি শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। যাহা হউক ইহাই আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিভূমি। আমরা এই কালকে বেদায়ুর্ব্বেদ বা দেবায়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আদি গুরু ব্রহ্মা, শেষ গুরু ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন, ইঁহারাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্ত্তক। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মণ-বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ বা মিশ্রায়ুর্ব্বেদ। মিশ্রায়ুর্ব্বেদই কালক্রমে বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ রূপে পরিণত হয় শেষকাল বা সর্ব্বায়ুর্ব্বেদ—মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। আমরা নিম্নে এই চারিটি বিভাগের বিবরণ প্রকটিত করিতেছি।

## দেবায়ুর্ব্বেদ।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতই ব্রহ্মাকে আয়ুর্ব্বেদের আদি গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ বিবৃত আছে যে, তিনি লক্ষ শ্লোকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে যখন মানবগণ অল্পায়ু ও অল্পমেধ হইয়া উঠিল, তখন তাহারা তদধ্যয়নে অক্ষম বিবেচনায় পিতামহ সমগ্র আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ন করিলেন। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অপর নাম সনৎকুমার। ইঁহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন। ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ—ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে শারীর বিজ্ঞানের আদি প্রচারক হয়েন। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে পাঁচজন গুরু পরম্পরা পর্য্যন্ত, স্বর্গে

আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে দৃষ্ট হইবে যে, ঋগ্বেদ কালে ইহারাই বৈদ্য বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিককালে যে সকল ভেষজতত্ত্ব বেদকোবিদের বহুগবেষণাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাই অল্পে অল্পে ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এক অত্যুৎকৃষ্ট শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়। বেদ-কবি মেধাতিথি বলিয়াছেন, "জলেতেই অমৃত, জলেতেই সমস্ত রোগ নাশক ওষধি বর্ত্তমান।" "হে (+) সোম তুমিই আমাদের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তরুর প্রভু।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জলের অসাধারণ রোগনিবারিণী শক্তি অতি প্রাচীনকালেই ভারত সমাজে বিদিত ছিল।

পুনশ্চ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তোত্রে সোম-কন্দের নিকট রোগ দৃঢ়করণার্থ প্রার্থনা বিদ্যমান দেখা যায়। সোমকন্দ যে শুদ্ধ বলকর ও মাদক এমত নহে, ইহা যে বহুবিধ জরাজীর্ণাপহারক, তাহাও সেই পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোমদেবের নিকট, কারণ পরবর্ত্তী স্তোত্রেই "হে সোম, তুমি অন্য তরুর সহিত বহু আবর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হও"—এরূপ বাক্যে সোম পদ কদাপি চন্দ্র নামান্তর নহে। সোমকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থান-ক্রিয়াদি ভেদে চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।*

তাঁহারাও ইহার অসাধারণ জরাপহারিণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে ওষধিপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুনরপি ২০শ সূক্তে "সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলেতেই সমস্ত ওষধি·····...·······...হে জল, তুমি আমাদের শরীরের নিমিত্ত রোগ নিবারক তেজের সৃষ্টি কর। ২১শ সূক্ত। এতদ্দ্বারা অনুমতি হয় যে, তৎকালে অধিকাংশ ভেষজই জলজ ছিল, জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইলে যে, বেদ-কবিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবেরও কল্পনা করিয়াছেন, কারণ অনেক সূক্তে সোমদেবের প্রার্থনাও বিদ্যমান আছে। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ আশ্বিন-রুদ্রাদির ন্যায় সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই, শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঋকে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বল লাভের নিমিত্ত রুদ্র দেবের প্রার্থনা বর্ত্তমান দেখা যায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে "স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্" বলিয়া অনেক তৈল-বটিকার প্রশংসা ধ্বনিও বিদ্যমান আছে। অন্যতর বেদকবিগৃৎ সমদ বলিয়াছেন, —"হে রুদ্র, তোমার প্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ঔষধিদ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাচিয়া থাকি। ওষধি তরুদ্বারা তুমি আমাদের সন্তানগণকে বলান্বিত কর। কারণ শুনিতে পাই, তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, আত্রেয় ধন্বন্তরি, সুশ্রুত এমন কি বাগভট পর্য্যন্ত ইহাদিগকে আশ্বিন, ইন্দ্রাদির ন্যায় বৈদ্য শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্রসারসংগ্রহাদি অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূরি ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ

---

+ অপ্‌সু অন্তরমৃতমপ্‌সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। ঋগ্বেদ সংহিতা।

* এক এব ভগবান সোমঃ স্থান ক্রিয়া ভেদেন চতুর্বিংশতিধাভিদ্যতে। যথা অংশুমান্ ভুঞ্জবাধশ্চৈব চন্দ্রমা রজত প্রভঃ।

অনুমিত হয় যে, তন্ত্রকারকগণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই ভ্রমানুসন্ধান পাইয়া বেদোল্লিখিত রুদ্র দেবকে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্য দেব রূপে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নৃপতিগণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতেন, ঋকেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তব, যে প্রণালীতে ভারতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পত্রপল্লব ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলসূত্র—আধার উর্ব্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি ঋকের সময়েই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গণ স্বাভিপ্সিত গণনানুসারে ঋকের কাল খ্রীঃ জন্মের পূর্ব্বে ২০০০বৎসরের অন্যূন বলেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের দুই একটি গলিত পত্র আজও যে প্রাপ্ত হইতেছি, অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ মাত্রেরই সাধারণতঃ জলের উপকারীতা, বহুবিধ জলজ পদার্থের রোগাপহারিণীশক্তি, উর্দ্ধজত্রুগত রোগ চিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষু রোগাপনয়ন ও রাজার আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশ্যকতা, সেই পুরাকালেই আর্য্যমনস্বীদিগের নির্ম্মল জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতিভেদও হয় নাই, ব্যবসায়-ভেদও হয় নাই। একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব রুচি অনুসারে উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেন। জনৈক বেদকবি এই বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন,—আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা তণ্ডুল প্রস্তুতকারিণী এবং আমি কবি।" ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল যাজনাধ্যায়নাদি ব্যতীত ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারিবেন না, তৎকালে এমন কোনো সামাজিক অনুশাসন ছিল না। কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কাহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য তখন আকুলিত হইত না।

## ব্রাহ্মণবৈদ্যায়ুর্ব্বেদ বা মিশ্রায়ুর্ব্বেদ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষ ভাগে ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে, সত্যের অনাময়ত্ব, রোগহীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্যঞ্জক, এস্থলেও রোগোৎপত্তি রোগবাহুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবে। এই সময়েই ভগবান ধন্বন্তরি জন্ম গ্রহণ করেন! ধন্বন্তরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কল্পনামিশ্রিত হইলেও উহার কাল্পনিকাংশে কবিপ্রতিভা ও সমুদায়ে ঐতিহাসিকতার সারবত্তা বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যভূমিতে ধন্বন্তরিই আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, যে কালে সমস্ত গ্রাম, নগর, উপনগর নানাবিধ মহামারীতে ব্যতিব্যস্ত, নিরুপায় আতুর অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনো পন্থা না দেখিয়া একেবারে হতাশ, সেই সময়েই অতি কুশল করুণাপরায়ণ বৈদ্যলাভ, সমস্ত প্রাণীর ভয়ানক পীড়া নিবারণের অমোঘ প্রায় উপায় লাভ, ভারত ক্ষেত্রের ধর্ম্মশীল মনুষ্যহৃদয়ে দয়ার নিধান মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতবাসী এইজন্যই ধন্বন্তরিকে অযোনিসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধন্বন্তরির অমানুষী প্রতিভাই তাঁহাকে নারায়ণ

রূপী বলিয়া ভারতের পুজোপহার প্রদান করিয়াছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থানব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব, সুতরাং বাধ্য হইয়াই শীঘ্র শীঘ্র অনেক আর্য্য ঋষি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদ্ শান্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় দ্বিজ মাত্রেই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু কালান্তরে ধন্বন্তরির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে ও ব্যবহার জীবিদের অনুশাসন ভয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তদ্ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। যাহাহউক এই সময়ের প্রথম ভাগ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ ও পরভাগে দ্বিজাতিগণের মধ্যে কেবল বৈদ্যগণ তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিশ্র কাল নামে অভিহিত করা গেল।

## ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্য।

স্কন্দ, গাড়ুর ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে ভগবান্ ধন্বন্তরি ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সমুদ্ভূত হয়েন। এইরূপ প্রথিত আছে যে, মহর্ষি গালব সমিৎ কুশাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বনোপান্তে উপস্থিত হইলেন। অধ্বশ্রান্ত, মুনি তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, বন বহির্ভাগে একটি কন্যা জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করিয়া গৃহে যাইতেছে। মুনিবর তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,—"হে কন্যে! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর, জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।" ব্রাহ্মণ-ভক্তি পরায়ণা কন্যা জলকুম্ভ প্রদান করিলে মহর্ষি গালব স্নান করিয়া যথেষ্ট জলপান করিলেন এবং অতি পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন,—"হে কন্যে! আমার পরিতোষ হেতু তোমার সৎ পুত্র লাভ হউক।" কন্যা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—"ভগবন! আমার যে বিবাহ হয় নাই।" গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা বলিলেন,—"আমার নাম বীরভদ্রা, আমি বৈশ্যকন্যা।" মুনিবর তচ্ছ্রবনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুনি সমাজে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন,—"মুনিবর! আপনি বড় মঙ্গল করিয়াছেন, এই বীরভদ্রার গর্ভে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিবেন।" এই বলিয়া সকলে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি সৌম্যাকৃতি কাঞ্চনরাশি গৌরবীর বালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন এবং জননী ক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অম্বষ্ঠনামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনিই বৈদ্যবংশের মূল সংস্থাপক।

---

# কায় চিকিৎসাক্রমোপদেশ।

## বাতব্যাধি।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

[ কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ]

—:০:—

কল্যাণকাবলেহ নামক ঔষধটিও বাতব্যাধির গদগদ ভাষী অবস্থায় হিতকর।

ইহার উপাদান

হরিদ্রা,—
বচ,
কুড়
পিঁপুল
শুঁঠ
কৃষ্ণজীরা
বনযমানী
যষ্টিমধু
সৈন্ধব

সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমান। ঘৃত মিশাইয়া ভক্ষণ করিতে হয়। শাস্ত্রকার এই ঔষধের গুণ পরিচয়ে বলিয়াছেন।

একবিংশতি রাত্রেণ ভবেচ্ছ্রুতিতিংরো নরঃ।
মেঘ দুন্দুভি নির্ঘোষো মত্ত কোকিল নিস্বনঃ॥

অর্থাৎ ইহা এক বিংশতি দিবস সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায় এবং মেঘ দুন্দুভির ন্যায় শব্দ অথচ কোকিলের ন্যায় সুমধুর ধ্বনি সমন্বিত বাক্যোচ্চারণ শক্তি জন্মিয়া থাকে।

বিশ্বচী ও অবাহুক রোগে—দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই—ইহাদের কাথে তৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রাত্রিকালীন ভোজনের পর তাহার নস্য লইবে।

বাহুশোষ রোগে—শাল পানির সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

গৃধ্রসী রোগে—মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দার কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ,সচল লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসী জন্য ও বস্তিদেশের স্থায়ী বেদনা প্রশমিত হয়।

পঙ্গুতা রোগে—দশমূল, বেড়েলা রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান হিতকর। খঞ্জতা ও গৃধ্রসী রোগেও ইহা উপকারী।

আধ্মান রোগে—পিপুল চূর্ণ ২ তোলা তেউড়ীর মূলচূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা, একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। দেবদারু, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ একত্র

কাজির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শূল ও আঘ্মান রোগ প্রকাশিত হয়।

**প্রত্যাধ্মান রোগে**—বমন ও লঙ্ঘন এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

**শিরোগ্রহে**—দশমূলের কাথ ও টাবা লেবুর রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিবে।

**অষ্ঠীলারোগে**—গুল্ম রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

**তূনী ও প্রতিতূনী রোগে**—স্নেহ পিচকারী দেওয়া উপকারী। হিং ও যবক্ষার মিশ্রিত উষ্ণ ঘৃত পান এই রোগে হিতকর।

**খল্লী রোগে**—কুড়, সৈন্ধব লবণ ও তক্র মিশ্রিত করিয়া ও গরম করিয়া মর্দ্দন করিবে।

**বাতকণ্টক রোগে**—জোঁক দ্বারা রক্ত শোষণ, এরণ্ড তৈল পান এবং উত্তপ্ত সূচী দ্বারা পীড়িত স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

**ক্রোষ্টুকশীর্ষে ও পাদদাহ রোগে**—বাত রক্ত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মসুর কলাই পেষণ করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে এরূপ অবস্থায় উপকার হয়। পদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হিতকর।

**পাদহর্ষ রোগে**—কুব্জ প্রসারনী তৈলের মর্দ্দন উপকারী।

সকল প্রকার বাতব্যাধিতেই তৈল মর্দ্দন করা প্রধান চিকিৎসা। কোষ্ঠস্থ বায়ুর পক্ষে নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। নিম্নে ঐ তৈলগুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

## নারায়ণ তৈলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোনাক পাটলা পারিভদ্রকম্।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধাচ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা স পুনর্ণবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতু দ্রোণেহম্ভসঃ
পচেৎ॥
পাদ শেষং পরিস্রাব্য তৈল পাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠ মেলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগ গন্ধা চ সৈন্ধবং স পুনর্ণবম্॥
এষাং দ্বিপলিকান ভাগান্ পেষয়িত্বা
বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরী রসঞ্চৈব তৈল তুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্য ক্ষীরং দদ্যা চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব
প্রশস্ততে॥

তিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ—বিল্ব ছাল, গণিয়ারি ছাল, শোনা ছাল, পারুল ছাল, পালিধা মাদারের ছাল, গন্ধ ভাদ্রলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্ণবা—প্রত্যেকের ৮০ তোলা, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শত মূলীর রস ১৬ সের এবং গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্ণবা মূল—ইহাদের প্রত্যেকটি

১৬ তোলা। এই তৈল পানে, মর্দ্দনে এবং বস্তি প্রয়োগে বিবিধ বাত রোগ বিনষ্ট হয়।

## বিষ্ণু তৈলম্।

শাল পর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহু পুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেবধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈল প্রস্থং
বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যংক্ষীরং দদ্যাচ্চতুগুণম্।

তিল তৈল ⁄৪ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ড মূল, বৃহতী মূল, কণ্টকারী মূল, নাটামুল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটী আট তোলা। যথা নিয়মে পাক করিবে।

## বৃহদ্বিষ্ণু তৈলম্।

জলধর মশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী।
কাকোলী ক্ষীর কাকোলী জীবন্তী মধু
যষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দন কুঙ্কুমম॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন রেণুকম্।
পর্ণিণী কুন্দখোটীশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈলস্থাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরীরস সমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ।

তিল তৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেত চন্দন, রেণুকা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, কুন্দরুখোটী, ও নখী—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা। জল ৬৪ সের।

## মধ্যম নারায়ণ তৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতীশ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাক বাট্যালক
পারিভদ্রম্।
ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতি বলাগ্নি মন্থং মূলানি চৈষাং
সরণীযুতানাম্॥
মূলং বিদধ্যাদ্দশ পাটলীনাং প্রস্থং সপাদং
বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ
রসেন তেন।
তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধ মাজং নিদধ্যা
দথবাপি গব্যম্॥
একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দ্দ্যাচ্চসক্কৈব
শতাবরীণাম্।
তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধা
মিষিদারু কুষ্ঠম্॥
পর্ণীচতুষ্কাগুরু কেশরাণি এলাস্র যষ্টি তগরাব্দ
পত্রম্॥
ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বু বচা পলাশং স্থৌণেয় বৃশ্চীরক
চোরকাখ্যম্।
এতৈঃ সমস্তৈ র্দ্বিপল প্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং
বিধিনাবিপক্বম্॥
কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং
ত্রিপল প্রমাণম্।
প্রস্বেদ দৌর্গন্ধ্য নিবারণায় দদ্যাৎ সুগন্ধার্থ
বদন্তি কেচিৎ॥

তিলতৈল ৩২ সের। কাথার্থ—বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোনা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষ চাকুলে,

গণিয়ারি, গন্ধভাদ্রলে ও পারুল—ইহাদের প্রত্যেকটী ২॥০ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের ; শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। শতমূলীর রস ৩২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, ঝুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেত পুনর্ণবা ও চোরপুষ্পী—ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬তোলা। গন্ধ দ্রব্য কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি। প্রত্যেক ৮ তোলা।

কোষ্ঠগত বাতরোগে তৈলের অভ্যঙ্গ ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্যবস্থার ঔষধগুলি সেবন করা হিতকর।

প্রাতে—চতুর্ম্মুখ অনুপান ত্রিফলা ও মিছরির জল কিম্বা শতমূলীর রস কিম্বা হেলেঞ্চার রস ও মধু।

বেলা ৩টায়—বজ্রক্ষার এক আনা মাত্রায়, মৌরির জলসহ। ২ বেলা আহারান্তে—বৃহৎ অগ্নিকুমার—গরম জল সহ। বৃহৎ অগ্নিকুমারের পরিবর্ত্তে বিট্ লবণের গুঁড়া দুই আনা মাত্রায় মুখে ফেলিয়া জল পান করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

উপরোক্ত ঔষধগুলির প্রস্তুতবিধি বলা যাইতেছে—

## চতুর্ম্মুখ রস।

রসগন্ধক লৌহাভ্রং সমং সূতাজ্জি, হেম চ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যা স্বরস মর্দ্দিতম্॥
এরণ্ড পত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্তরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক এক তোলা এবং স্বর্ণ।০ চারি আনা। ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধান্তরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে। ২রতি বটী।

## বজ্রক্ষার।

ফটকিরির চারিগুণ সোরা—অগ্নি উত্তাপে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

## বৃহৎ অগ্নিকুমার।

হরীতকী, যমানী, সৈন্ধব—প্রত্যেক ১ভাগ বহেড়া ২ভাগ—জলসহ মর্দ্দন, দুই আনা বটী।

কোষ্ঠগত বায়ু, বিকারে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ম অভয়াদ্য মোদক নামক ঔষধটি সপ্তাহে তিন দিন করিয়াও সেবন করান যাইতে পারে। ইহার উপাদান—

হরীতকী, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপত্র, পিপুল, মুথা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, প্রত্যেকটি ২ তোলা। দন্তীমূল ৬তোলা, চিনি ১২ তোলা, তেউড়ীমূল ১৬ তোলা। মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। রাত্রে আহারের পরে শীতল জল সহ সেব্য।

আমাশয়গত বায়ুর বিকারে—

প্রাতে রসোনপিণ্ড মাত্রা ॥০ তোলা, অনুপান এরণ্ড মূলের কাথ।

বেলা ৩টায় বাতগজাঙ্কুশ—বেড়েলার কাথ ও মধু।

সন্ধ্যায়—মহালক্ষ্মীবিলাস—পানের রস ও মধু এইরূপ ব্যবস্থা হিতকর। গুগ্‌গুলু ঘটিত ঔষধও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। উহার মধ্যে আদিত্যপাক গুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলুর ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এ দুইটি ঔষধের একটি প্রয়োগ করিলে রসোনপিণ্ড দিবার আর প্রয়োজন নাই।

মর্দ্দনের জন্য রসোনতৈল, সৈন্ধবাদ্য তৈল, এবং মূলকাদ্য তৈল প্রশস্ত।

নিম্নে এই আমাশয়গত বায়ু বিকারের সকল ঔষধেরই উপাদান বলা যাইতেছে।

## রসোন পিণ্ড।

পলমর্দ্ধ পলঞ্চৈব রসোনস্য সুকুট্টিতম্।
হিঙ্গুজীরক সিন্ধুত্থ সৌবর্চ্চল কটু ত্রিকৈঃ॥
চূর্ণিতৈর্ম্মাষিকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্।

রশুন ১২ তোলা পেষণ করিয়া তাহার সহিত হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

## বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ।

পারদ, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বালা, ধনে, কটফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, মরিচ, সোহাগা—প্রত্যেক সমভাগ। মুণ্ডী ও নিসিন্দা পাতার রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী। অনুপান আদার রস; নিসিন্দা পাতা ও আদার রস এবং মধু।

## মহালক্ষ্মী বিলাসো রসঃ।

পলং বজ্রাভ্র চূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধকং ভবেৎ।
তদর্দ্ধং বঙ্গ ভস্মাপি তদর্দ্ধং পারদং তথা॥
তৎসমং হরিতালঞ্চ তদর্দ্ধং তাম্র ভস্মকম্।
রস সাম্যঞ্চ কর্পূরং জাতী কোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারক বীজঞ্চ বীজং স্বর্ণ ফলস্য চ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং মৃতস্বর্ণঞ্চ শাণকম্॥
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জা ফল মানতঃ।

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অৰ্দ্ধ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী ও জায় ফল—প্রত্যেক ১ তোলা, বৃদ্ধদারবীজ ও ধুস্তুরা বীজচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ অৰ্দ্ধ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি বটী।

## আদিত্যপাক গুগ্‌গুলু।

ত্রিফলা ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল। দারুচিনি, এলাইচ—প্রত্যেক ২ তোলা, গুগগুলু ৫ পল। দশমূলের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৵০ দুই আনা মাত্রায় বটী। অনুপান গরম জল।

## ত্রয়োদশাঙ্গ গুগগুলু।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী
শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারকম্।
রাস্না শতাহ্বা সশঠী যমানী
সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্॥
তুল্যং ভবেৎ কৌশিক মত্র-
মধ্যে দেয়ং তথা সর্পিরর্দ্ধ ভাগম্।

বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষ (অভাবে ধনে), গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুলফ, শঠী, যমানী ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু

১২ তোলা এবং ঘৃত ৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা। অনুপান যথা, মাংসাদির যুষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল।

## রসোন তৈল।

তৈল /৪ সের। রসোন /১ সের। ক্বাথার্থ—রসোন /৮ সের। জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের।

## সৈন্ধবাদ্য তৈল।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
স্বর্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা।
এতান্যর্দ্ধ পলাংশানি শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানি কারয়েৎ॥
প্রস্থমেরণ্ড তৈলস্য প্রস্থাম্বু শত পুষ্পজম্।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্বা তথা মস্ত শনৈঃ পচেৎ॥

এরণ্ড তৈল /৪ সের। কথার্থ—সৈন্ধব, গজপিপুল, রাস্না, শুলফা যমানী, সাজিমাটি, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল লবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড়, ও পিপুল—প্রত্যেক ৪ তোলা। শুল্‌ফার ক্বাথ /৪ সের, কাঁজি /৮ সের, দধির মাত /৮ সের।

## মূলকাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের। মূলকের স্বরস বা শুষ্ক মূলার ক্বাথ /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের। কল্কার্থ—বেড়েলার মূল, সৈন্ধব, চিতামূল, পিপুল, আতইচ, রাস্না, চই, অগুরু, চিতামূল, ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, কুড়, শঠী, বেলশুঁঠ, শুলফা, তগরপাদুকা, দেবদারু—মিলিত /১ সের।

পকাশয়গত বায়ুর বিকারে—
প্রাতে—বৃহৎ বাতচিন্তামণি
অথবা—চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ
অথবা—বৃহৎ চিন্তামণি

ত্রিফলা ও মিছরির জল অথবা শতমূলীর রস ও মধু। মধ্যাহ্নে আহারের পর হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ—জলসহ এবং বৈকালে বজ্রক্ষার এক আনায় মাত্রায় মৌরি ভিজান জল সহ সেবন হিতকর। এইরূপ অবস্থায় সুশ্রুত সংহিতায় কাণ্ড লবণ ও পত্র লবণ সেবনের বিধি আছে। যদি এই দুইটী ঔষধের একটি ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ব্যবহারের আর আবশ্যক নাই। নারায়ণ তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈলের অভ্যঙ্গ এইরূপ অবস্থায় উপকারী।

(ক্রমশঃ)

# বাঙ্গালীর ধ্বংসের কারণ।

[ শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ]

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, "নির্ব্বংশ হ'বার আগে মরে পৌত্র।" এই প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী জাতির নির্ব্বংশ হইবার আর বিলম্ব নাই। কারণ এ জাতির পৌত্র পর্য্যায়ের 'শিশুই" অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে—বাঙালীর বংশ ধারা বজায় রাখিতে হইলে এই শিশু মৃত্যু বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। আমার বোধ হয় অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় কার্য্যের মধ্যে এই কার্য্যই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। কারণ যত কিছু যা' সুখ-সম্পদের জন্য আবশ্যক, সে সকলই জাতির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কথায় বলে 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।" যদি জাতির অস্তিত্বই লোপ পায়—যদি বাঙলা হইতে বাঙালীর বংশধারা একেবারে মুছিয়াই যায়, তাহা হইলে বাঞ্ছিত সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে কে? আগে বাঁচিবার চেষ্টা, পরে ভোগসুখের অন্যান্য কথা। বাঁচিতে হইলেই—জাতিকে রক্ষা করিতে হইলেই আগে—শিশুরক্ষার যত্ন লইতে হইবে।

শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য: তাহাদিগকে নিরোগ-শরীরে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অনেক কথাই প্রচার করা হইতেছে। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে আঁতুড় ঘরের দোষাদিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুর যাহা কিছু পুরাতন, সে সকলই নিন্দনীয়; তাই অন্যান্য সহস্রটার মধ্যে এও একটা নিন্দার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। তথাকথিত শিশুর শ্মশান স্বরূপ হিন্দুর আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থার মধ্যে কিছু দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তবু যেন মনে হয়, এ অনুষ্ঠান আশাপ্রদ হইলেও, অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন। কেন এরূপ মনে হয়, সংক্ষেপে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

এই আঁতুড় ঘর পূর্ব্বেও এখনকার মতই ছিল, কারণ বর্ত্তমান ত' পুরাতনেরই অনুকরণ। পুরাতনের আদর্শ লইয়াই ত বর্ত্তমান। সুতরাং বর্ত্তমান আঁতুড় ঘরের অনুরূপ আঁতুড় ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সেকালে ত এত শিশুমৃত্যু ছিল না। এখনও দেখি বঙ্গের পল্লীপ্রদেশে মধ বিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও পুরাতন প্রথার আঁতুড় ঘরই বর্ত্তমান। সে সকল স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী ও শিক্ষিত ডাক্তারের নিতান্তই অভাব; কিন্তু তথাপি কলিকাতা অপেক্ষা ঐ সকল স্থানে শিশু মৃত্যুর হার অল্প। কেন এরূপ হয় ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? একপ্রকার আঁতুড়েই জন্মগ্রহণ করিয়া কোন কোন স্থানে শিশু মরে না, আবার কোন কোন স্থানে প্রায়ই মরে, সুতরাং আমরা শিশু মৃত্যুর কারণ বলিয়া কেবল আঁতুড় ঘরকেই দোষী করিতে পারি না। যদি কেবল আঁতুড়ঘরের দোষেই এই দুর্ঘটনা

ঘটিত, তাহা হইলে ফল সর্ব্বত্রই সমান দেখিতাম। কিন্তু তা' যখন দেখিনা, তখন বুঝিতে হইবে এই আঁতুড় ব্যতীত আরও কিছু আছে, যাহাতে শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতেই রোগপ্রবণ শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং অল্প কারণেই রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই মরে।

অবশ্য আমরাও যে আঁতুড় ঘরের উন্নতি চাইনা তা' নয়। আমরা উন্নতি চাই, কিন্তু পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, পুরাতনকে একেবারে বন্ধ করিয়া নহে। পুরাতন আচার ব্যবহার এ জাতির যেরূপ মজ্জাগত, তাহাতে এই চিরাচরিত দেশীয় প্রথাটাকে একেবারেই যে সকলে বর্জ্জন করিবে তাহাও বোধ হয় না। আজকাল দেখিতে পাই, দেশীয় পূর্ব্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই এক শ্রেণীর সংস্কারকদলের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই শিশুপালন সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সে সকলের সবিশেষ আলোচনা এখানে আর করিব না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে প্রথাকে আমরা শিশুপালনের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু সেই প্রথায় প্রতিপালিত শিশু, এ দেশের শীতাতপ সহ্য করিবার শরীর লইয়া বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখনকার মত শীত-প্রধান দেশের আদর্শ প্রথায় প্রতিপালিত শিশু, ঠিক এদেশের উপযোগী শরীর পায় না; সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেকালের প্রথায় প্রতিপালিত অনেককেই জানি যাঁহারা একালের প্রথায় প্রতিপালিত খোকা বাবুদের তুলনায় অদ্ভুত মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

এই সকল দেখিয়াই আমরা বিশ্বাস করি না যে, কেবল মাত্র আঁতুড় ঘরের দোষেই বা শিশুপালনের পূর্ব্ব প্রথার জন্যই শিশুমৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই শিশুমৃত্যুর মূলে আরও কোন প্রবল ও গূঢ় কারণ বর্ত্তমান আছে। সে কারণ কি?

বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বালকজননীর শারীরিক অপূর্ণতা ও দৌর্ব্বল্য বশতঃই শিশুমৃত্যুর হার বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের যে শারীরিক বর্ণনা প্রাপ্ত হই এবং বৃদ্ধদিগের যেরূপ শ্রম সহিষ্ণু শরীর দেখিয়া, তাহার তুলনায় এখনকার চশমা আঁটা-টেরি-কাটা বাবুদের শারীরিক পার্থক্য যে কত তাহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা এখনকার কালে উপকথার মতই গালগল্প হইয়া পড়িয়াছে। সেকালে তাঁহাদের অটুট স্বাস্থ্য ছিল, সুপুষ্ট শরীর ছিল, সুতরাং তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া সংসার সুখ উপভোগ করিতেন। আর এখন তাঁহাদেরই বংশের ক্ষীণপ্রাণ খোকাবাবুদের দেখিলে মনে হয় কি এই সকল দুর্ব্বলদেহ মানবগুলি সেই বলিষ্ঠ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে?

এই দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ ত সেদিনও প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে যাহারা বর্দ্ধমানে হাঁটিয়া যাইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ নিশ্চয়ই ঘণ্টায় ২ মাইল পথ হাঁটিয়া বর্দ্ধমান কেন, সুদূর কাশী-

বৃন্দাবনাদি তীর্থ করিয়া আসিতেন। তাঁহারা কিন্তু তথাকথিত উন্নত প্রণালীর আঁতুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সকালে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে চায়ের মৌতাতেও অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নাই।

এই যে আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্য—এই যে আমাদিগের দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের পরিবর্ত্তন ইহা এক দিনেও হয় নাই, এক কারণেও হয় নাই। নানাকারণে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া এই ক্ষয় চলিয়া আসিতেছে। যেরূপ ভাবে এই ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আর ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। এখন ইহার উপর দৃষ্টিদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন জন্য যে ক্ষতি তাহার কথা আমি আর আলোচনা করিব না। কারণ এখন অনেকেরই "ম্যালেরিয়া" দমনের আগ্রহ দেখা যাইতেছে, এবং জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং আমি আর একটা দিক দেখিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি। ভরসা করি এ বিষয় সকলেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমাদের বিবেচনায় বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই দেশের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ। বালচাপল্য বশতঃই শরীর অপূর্ণ ও জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে। সেই অপূর্ণ শরীর ও ক্ষীণ শক্তির সন্তান যথোপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। সঙ্গদোষে সেও আবার বাল্যে অমিতাচারী হইয়া শরীর ও শক্তির অপচয় করিতে অভ্যস্ত হয়। এই সকল পুরুষের প্রজনন শক্তি কমিয়া যায়। তাই ঐ সকল পিতার পুত্রেরা অল্প অনিয়মেই রোগগ্রস্ত হয়, অথবা আঁতুড়েই মরে। যেটি বাঁচে সে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া কোন রকমে জীবনের ক'টাদিন কাটাইয়া দেয় মাত্র। দুঃখের বিষয় বাসকদিগের মত আজকালকার সস্তা গল্প উপন্যাসের পাঠিকা বালিকারাও সংযমহীনা হইয়া পড়িতেছে। দেশের লোকেও তাহাদিগের সম্মুখে অসংযমের মনোজ্ঞপ্রবৃত্তি আনিয়া দিতেছে! এই অসংযম ও চপল বৃত্তির জন্য ভাবী জননীরা নানারূপ ব্যাধি দুষ্ট শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সর্ব্বনাশ এইখানেই! এসকল বিষয় শুনিতেও লজ্জা করে, শুনাইতেও লজ্জা করে! কিন্তু আর লজ্জা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন কুৎসিৎকথা শুনিতেও হইবে, শুনাইতেও হইবে। আর আজকালকার নব্য অসংযমী আর্টিষ্ট সাহিত্যিক ও ছবিওয়ালা মাসিকের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারিগণকে সতর্ক করিতেই হইবে। নতুবা এজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

---

# হোমে আয়ুর্ব্বেদ।

[ শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ-বেদান্তবাগীশ ]

—১—

শ্রীভগবানের বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিমুখে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি বা ঘৃত সম্প্লুত সমিধ বিল্বপত্রাদির আহুতির নামই হোম। অগ্নিমুখেই দেবতারা ভোজন করেন; অগ্নিমুখে মন্ত্র সহকারে প্রদত্ত আহুতিই হবিঃ। এই হবিই দেবতাদের প্রিয় খাদ্য। এই হবিই অমৃত। এই হবির্ভোজন রূপ অমৃত পানেই দেবতা-শরীর বর্দ্ধিত। ইহা দ্বারাই দেবতারা বলশালী। দেবতারা বলশালী না হইলেই অসুরগণের প্রাদুর্ভাব ফলে সৃষ্টির ক্ষতি। উপনিষৎ ও পুরাণাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া সমন্বয় করিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই হবি ব্যতীত দেবতাদের অন্য অমৃত নাই।

উপনিষদে দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। "ত্রয়স্ত্রিংশত্বৈ দেবাঃ"। অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী, মন, বুদ্ধি, প্রাণ প্রভৃতিই দেবতা। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দেবতারা এই অগ্নিতে দত্ত আহুতি না পাইলে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়েন। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাৎ, ধূমকেতু, জলপ্লাবন, ও অনাবৃষ্টি এই সকলই অসুর। লোক রক্ষার্থে সৃষ্ট লোকপাল দেবতারা যাহাতে শক্তিশালী থাকেন, অসুরদের প্রাদুর্ভাব না ঘটে, তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্ন করা সকল মানবেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই হোমই দেব যজ্ঞ। "হোমো দৈবো"।

এই হোম ব্রাহ্মণের অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। উপনিষদধ্যায়ীই হউন বা বৈদিকই হউন, সকলকার পক্ষেই হোম অবশ্যানুষ্ঠেয়। "ত্রিণাচিকেত অগ্নি" "পঞ্চাগ্নি" উপনিষদের কথা। "অগ্নিহোত্রী" "আহিতাগ্নি" "সাগ্নিক গৃহস্থ" এই সকল শব্দাবলি দ্রষ্টব্য। আমাদের গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহ (কুশণ্ডিকা) প্রভৃতি সংস্কারে বৈদিক হোমরূপ দৈবযজ্ঞ অবশ্যানুষ্ঠেয়। শ্রাদ্ধ, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, গৃহপ্রবেশ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ব্যাপারেও এই দৈবযজ্ঞের নিয়ম। তান্ত্রিক দীক্ষা-পুরশ্চরণাদিতে তান্ত্রিক হোমের ব্যবস্থা। শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বহু শুভ কার্য্যেই হোম অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই অবশ্যানুষ্ঠেয় হোমরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ কি প্রকারে আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। "বিধিনিষেধে আয়ুর্ব্বেদ" 'সংস্কারতত্ত্বে আয়ুর্ব্বেদ" "হোমে আয়ুর্ব্বেদ", সকল ধর্ম্মকার্য্যেই আয়ুর্ব্বেদ। যাবতীয় খুঁটী নাটী পালনেও আয়ুর্ব্বেদ।

হোমে আয়ুর্ব্বেদের এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। হোমের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব নিয়মে আয়ু-

র্ব্বেদেয় মহোদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গিয়াছে। তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইব।

প্রথমতঃ হোমের অগ্নি শিখা যে স্থান স্পর্শ করে, সেই স্থান মালিন্যশূন্য, নিষ্কলুষ সত্ত্বগুণময় ও পুণ্যস্নিগ্ধ হইয়া উঠে। আহুত অগ্নির সুগন্ধি ধূমে দূষিত ও কলুষিত বাতাস নিমেষেই নষ্ট হইয়া যায়। হোমীয় ঘৃত গন্ধে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, অজীর্ণ নষ্ট হয়, সত্বগুণ বৰ্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, তমোগুণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হোমের ভস্ম ললাটে লেপন করিলে শিরোঘূর্ণন আরোগ্য হয়, কাজলরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। সন্ধিস্থলে লেপন করিলে বাতব্যাধির ভয় দূর হয়। হোমের ভস্মে তিলক পরিয়া যে কি শোভা হয়—তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অবগত আছেন। এক্ষণে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মহার্ঘতার ফলে নিত্য হোম সাধারণের পক্ষে কষ্টকর এবং কঠিনসাধ্য হইয়াছে। অতীতকালে যখন গব্যঘৃত সুলভ ছিল, জীবিকানির্ব্বাহ অতি সহজ ছিল—সে সময়ে নিত্যহোম সকলকার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বড় রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার নামই নৈমিত্তিক যজ্ঞ। এই যজ্ঞে কত যাজ্ঞিকেরা বৃহৎ হোম-কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া লেলিহান অগ্নিতে রাত্রিদিন আহুতি দিতেন। রাশি রাশি ঘৃতাহুতি হইত, বিল্বপত্র সমিধাদি ভারে ভারে সংগৃহীত হইত। সেই যজ্ঞীয় অগ্নি যখন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধে প্রস্থত হইত—সে এক অপূর্ব্ব শোভা।

এই যজ্ঞীয় তপ্ত হোমশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উপরিস্থ মেঘগুলির তাপ বিধান করে, বিশৃঙ্খল এবং বিছিন্ন মেঘগুলিকে জমাট বাধিয়া দিয়া একটি বৃত্ত অবিছিন্ন বৃহৎ মেঘে পরিণত করে। আর মেঘগুলির তলদেশে এমন একটি তাপময় চাপ দেয়, যাহার ফলে মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত করান দেশের মধ্যে যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা এই অনাবৃষ্টি অতি-বৃষ্টি পীড়িত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী সকলেই অবগত আছেন। আর এই ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত যজ্ঞের অধীন। সম্প্রতি যজ্ঞের ফলে বৃষ্টিপাত হইয়াছে—ইহার নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে।

অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতি সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

যজ্ঞীয় ধূমের শক্তি অসীম। ইহা দূষিত ও কলুষিত বাতাস এবং রোগের বীজাণু নষ্ট করেই; তদ্ভিন্ন এই ধূম তরুলতায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে পত্রপল্লবে ভূষিত করে, অপর্য্যাপ্ত ফল ও পুষ্পের ভারে অবনত রাখে। এই ধূমের স্পর্শে পত্ররাশি নিমেষের মধ্যে অধিকতর শ্যামল এবং চিক্কণ হইয়া উঠে। এই ধূমের ফলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভূমি "অকৃষ্ট পচ্যাইব শস্যসম্পদ" সম্পৎশালিনী হইয়া উঠে।

এই যজ্ঞিয়াগ্নির উর্দ্ধ প্রসৃত শিখাই যজমানকে স্বর্গমার্গ দেখাইয়া দেয়। আত্মা ঐ জ্যোতির্ম্ময় শিখাসূত্র অবলম্বন করিয়া সেই শান্তিময় স্থানে যাইতে সমর্থ হয়।

হোমের দ্বারা যেমন ঐহিক লাভ, তদ্রূপ পরলোকেরও উন্নতি। শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের, প্রাণের যেমন ঋদ্ধি বৃদ্ধি, আত্মারও ইহা সেইরূপই উপকারক।

বিল্বকাষ্ঠের অগ্নিতে সঘৃত বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া হোম করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই সুমধুর গন্ধে সেই গৃহ এবং গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ কি সুন্দর গন্ধে ভরপুর হয় তাহাও অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহের দোষ কাটাইতে এমন রসায়ন আর নাই। এমন কি হোমের শেষে পূর্ণাহুতিরূপে দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ রম্ভা ভোজন যে গর্ভ দোষের নিবারক—ইহা সাধারণ্যে প্রসিদ্ধই আছে।

যাঁহারা অজীর্ণ ব্যাধি ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছেন—তাঁহারা যদি কিছু-দিন নিয়মিত ভাবে বিল্বপত্রে হোম অভ্যাস করেন,তবে তাঁহারা রোগ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবেন। সাবধান, হোম করার সময় মস্তকে উত্তরীয়টি উষ্ণীশরূপে বাঁধা চাইই চাই। ইহা কেবল যে শাস্ত্রেরই নিয়ম তাহা নহে, পরন্তু বড়ই উপকারক।

শিষ্যালয়ে অনেক সময়ে আমাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে সঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা হোমও করিতে হয়। হোম করিয়া যথেষ্ট সুখ ও স্বস্তি হয়—অগ্নির তাপে মস্তকে কোনরূপ কষ্টও হয় না। কিন্তু রন্ধন-কালে অগ্নি তাপে কষ্ট হয়, সময়ে সময়ে মাথা গরম হইয়াও উঠে। হোমাগ্নিতে যে যে কামনা করিয়া আহুতি দিবে, সে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাই আমাদের শাস্ত্র-বিশ্বাস। যাহারা ঐহিক সুখ প্রয়াসী, স্বাস্থ্য-কামী তাহারা ঐ সুখ ও স্বাস্থ্যের অনুরোধেই হোম করিতে পারেন—তাহাতেও তাঁহাদের উপকার হইবে।

তাই বলিতেছি—আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধে আয়ুর্ব্বেদ, সংস্কার তত্ত্বে আয়ুর্ব্বেদ, হোমে আয়ুর্ব্বেদ, সকল খুটীনাটী পালনে আয়ুর্ব্বেদ।

## সুশ্রুতের সার্জ্জারি।

[ কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত এইচ, এম্‌, বি ]

যাঁহারা সুশ্রুত সংহিতা ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মহর্ষি সুশ্রুতকে একজন পাকা সার্জ্জন না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ক্রমে সুশ্রুতের অস্ত্র চিকিৎসা এখন দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের নিকট হইতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দিগকে মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত অস্ত্র চিকিৎসাকেই মূল ভিত্তি করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখনকার দিনে ডাক্তারি ও কবিরাজী—দুইটি নাম পৃথক ভাবে প্রচলিত হইলেও বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ হইতেই চিকিৎসা বিদ্যা নিঃসৃত হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র—সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব্ব—এই বেদ চতুষ্টয়েরই অন্যতম। অনাদি পুরুষ ব্রহ্মা—প্রাণী সমূহের সৃষ্টির প্রারম্ভেই বেদের সৃষ্টি করেন, আয়ুর্ব্বেদও সেই সময়ে তাঁহারই সৃষ্টি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা তাহারই শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমোন্নতির সাহায্যে অধুনা লোক সমাজে অদ্ভূত ব্যাপোর দর্শাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা মূলতঃ যে একই চিকিৎসা—একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

ডাক্তারিতেও অস্ত্র চিকিৎসায় যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের আবশ্যক. আয়ুর্ব্বেদেও যে সেইরূপ—সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে অস্ত্রকে যন্ত্র ও শস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহারই পরিচয় দিতেছি—

**যন্ত্র।** আয়ুর্ব্বেদে যন্ত্র সর্ব্ব সমেত একশত একটি ইহারা মূলতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা, ১। স্বস্তিক যন্ত্র। ২। সন্দংশ যন্ত্র। ৩। তাল-যন্ত্র। নাড়ী যন্ত্র। ৫। শলাকা যন্ত্র। উপযন্ত্র। এই ছয় প্রকার যন্ত্রের মধ্যে স্বস্তিক যন্ত্র চব্বিশ প্রকার, এই যন্ত্র অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ করিতে হয়। এই চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্রের নাম—সিংহ মুখ যন্ত্র, ঋক্ষ মুখ যন্ত্র, তরক্ষুমুখযন্ত্র, বৃক মুখ যন্ত্র, ভল্লূক মুখ যন্ত্র, দ্বীপী মুখ যন্ত্র, বিড়াল মুখ যন্ত্র মৃগ মুখ যন্ত্র, এর্ব্বারুক ( হরিণের ন্যায় পশু বিশেষ ) মুখ যন্ত্র, কাক মুখ যন্ত্র, কঙ্ক মুখ যন্ত্র, কুরর (কুল্লো, কুরুল পক্ষী) মুখ যন্ত্র, চাস (নীলকণ্ঠ পক্ষী) মুখ যন্ত্র, তাস ( শিক্‌রে পাখী ) মুখ যন্ত্র, শশঘাতী ( শরাল পাখী ) মুখ যন্ত্র, উলূক ( হুতুম পেচা ) মুখ যন্ত্র, চিল্লি ( চিল্ ) মুখ যন্ত্র, শ্যেন ( বাজ পাখী ) মুখ যন্ত্র, গৃধ্র মুখ যন্ত্র, ক্রৌঞ্চ মুখ যন্ত্র, ভৃঙ্গিরাজ মুখ যন্ত্র, অঞ্জলি ( পক্ষী বিশেষ ) মুখ যন্ত্র, কর্ণাবভঞ্জন ( পক্ষী বিশেষ ) মুখ যন্ত্র ও নন্দী মুখ যন্ত্র।

**সন্দংশ যন্ত্র।** ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার, কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত এবং তাহাতে খিল থাকে, ইহাকে সনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র বলে। অন্য প্রকার খিল বিহীন, ক্ষৌরকারের সন্নার অনুরূপ, ইহাকে অনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র বলে। এই সন্দংশ যন্ত্র দৈর্ঘ্যে ১৬ অঙ্গুলি। এই যন্ত্র দ্বারা চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে সংবিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির করিতে হয়।

**তাল যন্ত্র।** ইহাও দুই প্রকার, একটি মৎস্য তালের ন্যায় অর্থাৎ শঙ্কের ন্যায় পাতলা ও বক্র, এক মুখ বিশিষ্ট এবং অপরটি দুই মুখ বিশিষ্ট। এই যন্ত্র দ্বারা কর্ণ ও নাসিকাদির মলাদি বাহির করিতে হয়। এই যন্ত্র ১২ অঙ্গুলি লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

**নাড়ী যন্ত্র।** এই যন্ত্র নানাবিধ আকারে প্রস্তুত করিতে হয়। সাধারণতঃ মুখ ভেদে ইহা দুই প্রকার, এক প্রকারের একদিকে মুখ থাকে এবং অন্য প্রকারের দুই দিকে মুখ থাকে। এই যন্ত্রসকল ছিদ্র বিশিষ্ট। এই যন্ত্র দ্বারা দেহের স্রোতোগত কণ্টকাদি শল্য বাহির করা হয় এবং শরীরের মধ্যগত ফোড়া ও অর্শাদি রোগ পরীক্ষা করা হয়। ইহা ভিন্ন এই যন্ত্র সাহায্যে দেহ মধ্যস্থ ক্ষতাদিতে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং আরও নানারূপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

**শলাকা যন্ত্র।** ইহাও আটাইশ প্রকার। এই আটাইশ প্রকারের মধ্যে গণ্ডূপদ বা কেঁচোর মুখের স্বরূপ শলাকা যন্ত্র দুই প্রকার, শরপুঙ্খ মুখের অনুরূপ দুই প্রকার, সর্পফণা মুখাকৃতি দুই প্রকার ও বড়িশ মুখাবৃতি দুই প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে গণ্ডূপদ মুখাকৃতি দুইটি এষণ অর্থাৎ ব্রণাদির শোষ বা নালী অন্বেষণে ব্যবহার করিতে হয়। শরপুঙ্খ মুখাকৃতি দুইটি ব্যূহন কার্য্য অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যগত কোনো অংশ ছেদন পূর্ব্বক তুলিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়, সর্পফণাকৃতি দুইটি চালন কার্য্যে অর্থাৎ আঘাতাদি হেতু স্থানান্তরিত অস্থি প্রভৃতি চালনা করিয়া স্বস্থানে নিয়োজনার্থ এবং বড়িশ মুখাকৃতি দুইটি আহরণ কার্য্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কণ্টকাদি কোনো বস্তু আহরণ পূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়।

আর কয়েক প্রকার শলাকা যন্ত্রের মধ্যে দুই প্রকার অর্দ্ধ খণ্ড মসুর দাইলের আকারের মত এবং অল্প আনত মুখ বিশিষ্ট। স্রোতগত কণ্টকাদিশল্য ইহাদের দ্বারা বাহির করা হয়। ক্ষতস্থান পরিষ্কারের জন্য তুলির মত ছয় প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়, ইহাদের মুখে বা অগ্রভাগে তুলান জড়ান থাকে। হাতার আকারে তিন প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহাদের আকার হাতার ন্যায় এবং মুখ গঠন খলের অনুরূপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষতস্থানে ক্ষার এবং ঔষধাদির প্রয়োগ করিতে হয়। ব্রণাদি দগ্ধ করিবার জন্য ছয় প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তিন প্রকার জাম ফলের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট এবং তিনটি অঙ্কুশের ন্যায় বক্র মুখ বিশিষ্ট। নাসিকাদির মধ্যগত আব তুলিবার জন্য কুলের আঁটির মধ্যগত শস্যের অর্দ্ধ খণ্ডের অনুরূপ এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। আর এক প্রকার শলাকা যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে এক প্রকারের আকার মাষ কলাইয়ের ন্যায় স্থূল এবং উহার দুইদিকে পুষ্পের মুকুলের মত দুইটি মুখবিশিষ্ট। এই যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। আর এক প্রকার শলাকা যন্ত্র আছে—তাহার মুখের অগ্রভাগ মালতী পুষ্পের বোঁটার ন্যায় স্থূল ও গোলাকার। এই যন্ত্র দ্বারা মূত্রমার্গ, যোনিদ্বার ও লিঙ্গনাল পরিষ্কার করিতে হয়।

**উপযন্ত্র।** ইহা পঁচিশ প্রকার। রজ্জু, বেণীকা, পাট, চর্ম্ম, বল্কল, লতা, বস্ত্র, অষ্ঠীলাশ্ম, মুদ্গর, হস্ততল, পদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, নখ, চুল, মুখ, অশ্বকটক ( ঘোড়ার মুখ সংলগ্ন লৌহ বলয় ) বৃক্ষ শাখা, ষ্ঠীবন ( থুতু ), প্রবাহন ( বমন, বিবেচনাদি ), হর্ষ ( সন্তোষজনক দ্রব্যাদি ) অয়স্কান্ত ( পাষাণ বিশেষ ), ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ।

**শস্ত্র।** ইহা বিংশতি প্রকার। মণ্ডলাগ্র, করপত্র,—বৃদ্ধিপত্র, নখশাস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল পত্র, অর্দ্ধধার, সূচ, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারী মুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতস পত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী।

**নানা প্রকার শস্ত্রের পরিচয়।** মণ্ডলাগ্র ও করপত্র (করাত) নামক অস্ত্র ছেদন ( কর্ত্তন ) ও লেখন ( আঁচড়ান বা ছাল তোলা ) কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। বৃদ্ধি পত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা,

উৎপল পত্র ও অর্দ্ধধার নামক পাঁচ প্রকার অস্ত্র—ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। স্থচী (স্থঁচ), কুশপত্র, আটী-মুখ, শরারী মুখ, অন্তর্মুখ, ও ত্রিকূর্চ্চক নামক ছয় প্রকার অস্ত্র—বিস্রাবন কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণাদি হইতে—পূয রক্তাদি নিঃসারণ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। কুঠারিকা, ব্রীহি মুখ, আরা, বেতস পত্র ও স্থচী—এই পাঁচ প্রকার অস্ত্র—ব্যধন কার্য্যে অর্থাৎ কোনো স্থান বিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। বড়িশ ও দন্তশঙ্কু নামক অস্ত্রদ্বয়—আহরণ কার্য্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কোনো শল্য আহরণ পূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য ব্যবহার্য্য। এষণী অস্ত্র—এষণ কার্য্যে অর্থাৎ দেহ মধ্যগত কোনো বস্তু অন্বেষণ করিবার জন্য এবং অনুলোমন কার্য্যে অর্থাৎ কোনো দ্রব্য উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আনিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। স্থচী—অস্ত্র—শরীরের কোনো অংশ সেলাই করিবার জন্য ব্যবহার্য্য।

এই সকল অস্ত্র কিরূপ ভাবে বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুর শরীরে প্রয়োগ করিতে হয়, কোন্ অস্ত্র কাহার শরীরে প্রয়োগ করা উচিত নহে—সে সকল পরিচয় স্থশ্রুত অতি সুন্দর রূপেই দিয়াছেন, আমরা এস্থলে আর সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া পুঁথি বাড়াইব না। এখনকার দিনে ডাক্তারি অস্ত্র চিকিৎসা, সমুন্নতি লাভ করিলেও আর্য্য ঋষি এক সময়ে এ সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র এইস্থলে প্রদান করিলাম।

---

# ওলাউঠার কারণ নির্ণয়।

—:o:—

ওলাউঠার কারণ বহুতর, এবং তাহাদের কার্য্য অনেক সময়ে যুগপৎ ও মিশ্রভাবে হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণকে তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ;—

প্রথম। ব্যাপক (Epidemic) কারণ, যথা সৌর উত্তাপ; শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা; বায়ু মণ্ডলস্থিত তড়িৎ; ওজোন (ozone) বা ঘ্রাণকের অভাব; বিষবায়ু (Malaria)।

দ্বিতীয়। ভৌম (Telluric) কারণ, যথা, অনুপদেশ বা নিম্নভূমি। তৃতীয়। দৈশিক (Endemic) কারণ যথা,—তীর্থাদি উপলক্ষে দূর যাত্রা; দুর্গন্ধ উত্তাপ (Effluiria); অপরিষ্কার জল; অপকৃষ্ট খাদ্য ও অতিভোজন; দন্তোদ্গম জন্য উপদাহ; বিরেচক ঔষধ; সুরা; স্নায়বোত্তেজক অর্থাৎ বায়ুবৃদ্ধিকারক; মানসিক আবেগ; রাত্রিগত কাল প্রভাব বিশেষ; এক ব্যক্তির এবং এক জাতি বারংবার আক্রান্ত হইবার প্রবণতা।

সৌর উত্তাপ। ওলাউঠার উৎপাদন

* এই প্রবন্ধটি একজন এম, বি ডাক্তারের লিখিত এজন্য ইহাতে যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আলোপ্যাথিক মতেই বর্ণিত। আং সং।

সম্বন্ধে সূর্য্যোত্তাপের যে বিশিষ্টরূপ প্রভাব আছে; ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। সমশীতোষ্ণ দেশে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই ছয় মাসেই ওলাউঠা বেশী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, বৎসরের সকল সময়েই ওলাউঠা হইতে দেখা যায়, যে সময়ে সূর্য্যোত্তাপ খুব বেশী হয়, তাহার প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরে বায়ুমণ্ডলে ঐ উত্তাপাধিক্যের প্রভাব বলবান হইয়া থাকে; যে সকল ব্যাধির শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে অতিরিক্ত উষ্ণতা আনুকুল্য করিয়া থাকে, তাহারা প্রায় উত্তাপাধিক্য হওয়ার কিছুকাল পরে প্রভাব প্রকাশ করে।

শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা। যদিও ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে উষ্ণতাধিক্যের প্রয়োজন হয়; পরন্তু এই উত্তাপ-বাহুল্যের সহিত যখন প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতার চূড়ান্ত পরিমাণ ও শৈত্যের চূড়ান্ত পরিমাণ এই দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেশী তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়েই এই রোগের বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বায়ুমণ্ডলের শুষ্ক ও স্বচ্ছভাব ওলাউঠা বিকাশের অনুকূল; কিন্তু ইহাও অতিশয় শীতোষ্ণতান্তরের সহবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। মেঘাচ্ছন্ন দিনে দিবাভাগ ঠাণ্ডা থাকে, এবং রাত্রিভাগ অপেক্ষাকৃত গরম থাকে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া, আমাদের এই বঙ্গদেশে বর্ষার কয়েক মাসে, উত্তাপমান যদিও গড়ে ৮৩ অংশ থাকে, তথাপি, ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা কম হইয়া থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে যদিও ৩ মাত্র উষ্ণতা বাড়ে, তথাপি ঐ দুই মাসে ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি হয়।

শুষ্ক বায়ু, প্রচণ্ড ও গ্রীষ্ম ও শীতোষ্ণতার অতিমাত্র অন্তর, ওলাউঠায় উৎপাদন পক্ষে অনুকূল অবস্থা; আর আর্দ্র বায়ু, প্রচণ্ড উত্তাপ শীতোষ্ণতার অনুমাত্র অন্তর তৎপক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল. কিন্তু শীতোষ্ণতার অন্তরের সহিত যত, বায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতার সহিত ওলাউঠার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তত নয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যদিও মধ্যে মধ্যে শুষ্ক গ্রীষ্ম সময়ে ওলাউঠা দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ মড়ক বর্ষার সময়েই হয়। শীতোষ্ণতার অতিমাত্র তফাতের দ্বারা যে উদর পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তাহার প্রমাণ স্থলে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। সমতল হইতে দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পাহাড়ের উপর উঠিলে, অনেক সময় উদরাময় হইতে দেখা যায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কখনও কখনও অত্যন্ত শীতাধিক্যের সময়েও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮৬৬ সালে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রচণ্ড শীতের সময়ে একবার ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা বেশী হয় নাই। ১১ হাজারেরও অধিক লোকে আক্রান্ত হয়, ২৭০০ আন্দাজ মরে।

বায়ু মণ্ডলস্থিত তাড়িত। আমরা ধ্রুব যে বিশ্বব্যাপী তাড়িতের রূপান্তর মাত্র, ইহা প্রায় দেহতত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ওলাউঠাকে যদি বায়ু মণ্ডলের ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে, তাড়িতের পরিবর্ত্তন বিশেষের দ্বারা যে উহার

উৎপাতের আনুকুল্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না; অপিচ উত্তাপের সহিত যে তাড়িতের সম্বন্ধ আছে, তাহার নিদর্শন দেখ, গ্রীষ্মকালে যেদিন যত গরম হয়, সে দিন প্রায়ই দিবাশেষে মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যাধির সহিত যে বায়ু মণ্ডলস্থিত তাড়িতের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব, তৎপ্রতিপাদনার্থ ডাক্তার চার্চ হিল প্রণীত ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকে প্রসবান্তিক আক্ষেপ রোগ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মোল্লেখ করিতেছি। তিনি অনেকবার গ্রীষ্মের সময়ে এবং যৎকালে মেঘসকল বৈদ্যুতিক দ্রবে পূর্ণ আছে, আকাশের ভাব দেখিলে বৃষ্টি-বজ্রপাত হইবে কি—এই কতক্ষণ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া বোধ হইয়াছে এই রকম সময়ে এই রোগ অনেকগুলি হইতে দেখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অনেক চিকিৎসকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যখন ইহা উপস্থিত হয়, তখন একেবারে কতকগুলি প্রসবান্তিক আক্ষেপের কেস (case) হইয়া থাকে, যেন কোন বিশেষ বহুব্যাপী কারণের উপর তাহার উৎপত্তি নির্ভর করে।

ফরাসী বিদ্রোহের পর যৎকালে প্যারী নগরের সমস্ত হাসপাতাল আহত ব্যক্তিতে ভরা ছিল, সেই সময় একদিন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত হয়। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সকল হাসপাতালেই মৃত্যুসংখ্যাও পূর্ব্বের ও পরের সকল দিন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

অপিচ, বিদ্যুদাহত ব্যক্তিদিগের ওলাউঠার প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভ্রম, মূর্চ্ছা, কর্ণনাদ, বধিরতা, আক্ষেপ—স্থায়ী ও পৌনঃপুনিক উভয়বিধ—এ সমস্তই দৃষ্ট হয়। শ্বাসকৃত, হৃদ প্রদেশের নিষ্পীড়ন, ঊর্দ্ধোদরে নিষ্পীড়ক ব্যথা, এ গুলিও নিতান্ত বিরল নহে। এই অবস্থায় স্বর ক্ষীণ ও লুপ্ত ওলাউঠার শেষোক্ত লক্ষণও কখনও কখনও উপস্থিত হইয়া থাকে। বমন সচরাচরই। নির্গত হইতেও দেখা যায়। উদরাধ্মান, অন্ত্র সমূহের ক্রিমিবৎ সঞ্চরণ ও আক্ষেপিত সঙ্কোচনের ন্যায় সঞ্চরণ এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। তদ্ভিন্ন বায়বীয় তাড়িতের যতগুলি লক্ষণ উৎপন্ন করে, তন্মধ্যে অতীসারই অধিকস্থলে দেখা যায়। ফারম্যান কতকগুলির পক্ষীর শরীরে তাড়িত প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহারা সর্ব্বাগ্রেই মলত্যাগ করে এবং অধিকক্ষণ বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিতে থাকিলে মল ক্রমশঃ তরল হইয়া পরিশেষে জলবৎ হয়। মূত্রাঘাত (uremia) সচরাচরই হইয়া থাকে।

আঘাত মাত্র বিদ্যুদাহত ব্যক্তির সম্পূর্ণ হিমাঙ্গাবস্থা (colapse) উৎপন্ন হয়, এবং এই অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। নাড়ী কখনও ক্ষীণা, কখনও অননুভাব্যা (imperceptible); ক্বচিৎ কোমলা ও সহজে দমনীয়া, কখনও বা এই সকল লক্ষণ যুক্তা থাকে এবং দ্রুত হয়। পরন্তু অধিকাংশ স্থলে বিলক্ষণ মন্দাই দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও সূক্ষ্মা মধ্যা লোপিনী এবং বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে শরীর শীতল—তুষারবৎ—বিশেষতঃ হাত পা যে ঘর্ম্ম থাকিলে উহা শীতল ও পিচ্ছিল হয়।

কতকটা সময়—প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা পরে এই অবসাদনাবস্থা হয়, তা'র পর ইহার শেষে

প্রতিক্রিয়াবস্থা উপস্থিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রবল ও স্থায়ী থাকে। তখন নাড়ী দ্রুতগতি সম্পূর্ণ ও কঠিন হয়। কায়োত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অবশেষে অগ্নিবৎ হয় এবং কখনও কখনও রোগী প্রচুর ঘর্ম্মে স্নাত হইয়া উঠে। এই জ্বর সত্বরই উপশমিত হইয়া নিদ্রাংশ হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রবল হইয়াও উঠে ও তৎসঙ্গে অন্য উপসর্গেরও যোজনা হয়।

ডাক্তার ম্যাকফার্শন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৬ সালে যৎকালে সেণ্টপিটার্সবার্গে ওলাউঠায় মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কম্পাসের কাঁটা নৈসর্গিক আকর্ষণের অনুগামী হইত না, এবং যে চুম্বকে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চে পঁচাত্তর পাউণ্ড ভার ধারণ করার কথা, তাহায় শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে, শেষ রোগের যখন বড় প্রাদুর্ভাব, তখন উহার ১৫ পাউণ্ড মাত্র ভার ধারণের শক্তি ছিল। আবার রোগ যেমন কমিতে লাগিল, উহার শক্তিও তেমনি বাড়িতে লাগিল। অবশেষে উহার পূর্ব্ব শক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইল। ১৮৪৯ সালে, আয়ার্ল্যাণ্ডে যে মড়ক হয়, তাহাতেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। অপিচ, অনেক সময়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গেলে তারই পরে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, ইহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। এরূপ ঘটনা হামেসাই হয়, যখন ওলাউঠা ব্যাপকাকারে বিস্তৃত নহে।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ল্যান্সেট পত্রে ডাক্তার জে, সি এট্‌কিনসন একবার লিখিয়াছেন যে, ওলাউঠা রোগীর হিমাঙ্গাবস্থায় অধিকক্ষণ কম্বল জড়াইয়া রাখিয়া তাহার পরে অন্ধকারে তাহার শরীর স্পর্শ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি অঙ্গুলির অগ্রভাগের সহিত চট্‌ চট্‌ করিয়া বহির্গত হয়। আমরা এরূপ কখনও হইতে দেখি নাই। এবং আর কেহ দেখিয়াছেন, এমনও শুনি নাই।

ওজোন (Ozone) বা ঘ্রাণকের ন্যূনতা। যখন যে প্রদেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সেখানে ঘ্রাণকের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং বায়ুমণ্ডলে ঘ্রাণকের আধিক্য হইলেই প্রায়ই প্রতিশ্যায় ব্যাপক রূপে প্রকাশ পায়।

বিষ বায়ু (Malaria)। বন্যার পর যখন জল কমিতে আরম্ভ হয়, তখনই ম্যালেরিয়া বা বিষ বায়ুর উদ্ভব হয়, ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। যে গ্রামে বন্যার জল উঠে, সেখানে হয় জ্বর, নয় ওলাউঠা, হয় তো দুইটাই এক সঙ্গে কিংবা একটি আগে একটি পরে হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার জানা কথা। ডাক্তার ওয়াইজ পূর্ব্ব বঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যৎকালে আমাতীসার ও জ্বর জঙ্গল প্রদেশে খুব প্রবল, তখন প্রত্যাবর্ত্তনশীল মেঘনার চড় সীমান্তে—ওলাউঠা সর্ব্বনাশ করিতেছিল। তাদৃশস্থলে জ্বরকে যদি কোনস্থানের আমদানী না বলি তো ওলাউঠাকে তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। নিম্ন বঙ্গে ভাদ্র মাসে বন্যা সুরু হয়, এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে শুকাইতে থাকে। ওলাউঠায় মৃত্যু সংখ্যা যে ঐ সময় বরাবর বেশী হয়, ইহাও তাহার একটি কারণের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

বিষ বায়ু জনিত জ্বর প্রায়শঃ কম্পজ্বরা

কারে প্রকাশ পায়। অনেকে কম্পজ্বর ও ওলাউঠায় তুলনা করিয়া থাকেন। কখনও কখনও এক প্রকার জ্বর কোনও কোনও স্থানে হইতে দেখা যায়। তাহাতে সর্ব্বাগ্রে শীত হইয়া, পরে পীত বা হরিৎবর্ণ পিত্ত বমন ও রেচন হইতে থাকে এবং উদরে ব্যথা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখশ্রী বিশীর্ণ হয়। চক্ষুর্দ্বয় বসিয়া যায় ও তাহাদের চারি পার্শ্বে গর্ত্ত হইয়া স্বর বসিয়া যায়। অধঃ পালাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরে সর্ব্ব শরীর নীলবর্ণ ও শীতল হইয়া যায়। জিহ্বা স্থূল ও সরস কিন্তু তুষার শীতল হয় এবং তৎসঙ্গে আভ্যন্তরিক দাহ ও দারুণ পিপাসা উপস্থিত হয়। নাড়ী সূক্ষ্ম সূত্রবৎ এক একবার মাত্র পাওয়া যায়, কিছুকাল পরে একেবারেই থাকে না। মূত্রস্রাব নিরুদ্ধ হয়, পায়ের ডিমে ও কোমড়ে যন্ত্রণাজনক খিল ধরিতে থাকে, এবং রোগী ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে থাকে। রোগীকে হৃৎশূলে ধরে, তাহার দম আটকাইয়া আইসে। বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে কসিয়া ধরে, রোগী শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। উৎকণ্ঠাকুল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, তাহার উপর আবার সর্ব্বক্ষণ বমন ও ভেদ। শ্বাস ক্রিয়া উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্র সাধ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। হৃদ্দৌর্ব্বল্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে হইতে থাকে এবং হৃদয়ের আঘাত আর টের্ পাওয়া যায় না, শীতল ঘর্ম্মে রোগীকে ভাসাইয়া দেয় এবং সে দম আটকাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই তুফানের মধ্যেও তাহার জ্ঞান প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। আর যদি রোগী না মরে, তবে হঠাৎ প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। নাড়ী অল্পে অল্পে দেখা দিতে থাকে, চর্ম্ম সহজ বর্ণ ও নরম হইতে থাকে। হৃদয়ের মন্দ মন্দ গতি ক্রমশঃ নিয়মিত ও শ্রবণ গোচর হয়। শ্বাস সহজ ও ক্রমে দীর্ঘ হইতে থাকে। মুখের শবাকৃতিত্ব ঘুচিয়া যায়, বমি আর হয় না এবং ভেদ একেবারে থামিয়া যায়। যদি প্রতিক্রিয়া বেশী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অনেক সময়ে বিরূপ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জ্বরের ওলাউঠার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে, কিন্তু প্রভেদও আছে। ইহাতে যে দ্রব্যের স্রাব হয়, তাহা পীত হরিৎ বা পিত্ত মিশ্রিত; ওলাউঠায় আস্রাব তণ্ডুলোদকবৎ। ওলাউঠায় মুখের চেহারা যত বিকৃত হইয়া যায়, এ জ্বরে তত হয় না। কলিকাতায় একবার এইরূপ ওলাউঠাধর্ম্মী জ্বর হইয়াছিল। হিজলী অঞ্চলে অনেক সময়ে ঠিক ওলাউঠার লক্ষণ লইয়া জ্বরের আবেশ হয়। এমন কি প্রভেদ করা কঠিন হয়।

আনূপ বা নিম্ন ভূমি। লণ্ডন নগরে একবার ওলাউঠার মড়ক হইয়াছিল। ডাক্তার ফার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে সহরের যে ভাগ যত বেশী উচ্চ, সেই ভাগে মৃত্যু সংখ্যা তত কম হইয়াছিল। সমুদ্র সীমা হইতে যে সকল স্থান অনুচ্চ, নদীতীরস্থিত স্থান সকল, এবং নদীমুখ সন্নিকট স্থান সমূহ ওলাউঠার প্রিয় বিহার স্থান। নিম্নভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্য স্থানে ওলাউঠা কম হইয়া থাকে। তথাপি দার্জ্জিলিং সিমলা মসূরি প্রভৃতি শৈলনগরীও ইহার উৎপাত বিলক্ষণ সহ্য করিয়া থাকে।

তীর্থাদি উপলক্ষে দূর যাত্রা।—ভূয়োদর্শন দ্বারা ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা অবগত হইয়া-

ছেন যে ভারতবর্ষে গোরা ও সিপাহী উভয় জাতীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শিবিরে অবস্থান কালের অপেক্ষা অভিযান কালে মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। জগন্নাথ-যাত্রীদিগের মধ্যে বৎসরে বৎসরে অনেকেই ওলাউঠার কাল কবলিত হন। যেখানেই তীর্থদর্শনোপলক্ষে জন সমাগম বেশী হয়, সেখানেই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মক্কা নগরেও হজ উপলক্ষে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে কলেরা প্রায়ই দেখা দেয়।

দুর্গন্ধ উদ্বাষ্প। ইহা ওলাউঠায় উৎপত্তির অন্যতম কারণ। সত্য বটে ইহার অস্তিত্ব সত্ত্বেও অনেক স্থান এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে; কিন্তু পাইখানা, গাড়ী, নর্দ্দমা, পচনশীল জান্তব ও উদ্ভিদ্ আবর্জ্জনা অথবা মানব দেহগত পদার্থ নিচয়ের একত্র অতি সমাবেশ যে স্থানে থাকে, সেই সেই স্থানে যে ওলাউঠা সমধিক মারাত্মক ও সমধিক ব্যাপ্তিশীল হয়, তাহা অনেকবার দেখা গিয়াছে।

অবিশুদ্ধ জল। ইহা যে ওলাউঠার একটি কারণ তাহা ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে। অবিশুদ্ধ জলপানে যে ওলাউঠা রোগ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সর্ব্ব দেশের চিকিৎসকগণ একমত। সুতরাং উহায় সবিস্তার বর্ণনার আবশ্যকতা নাই।

---

# বাবুমহলে হার্টফেল।

[ শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ]

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

—:o:—

এক একখানি আস্ত, নিখুঁত, নিরেট, শক্ত, সারবান্ কঠিন ইষ্টক বা প্রস্তরের উপর আর একখানি স্থাপন করিয়া কালক্রমে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা বা সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ছাতাপড়া নোনাধরা, ঠুন্‌কো ইট, কাঠ, পাথর দিয়া কি মজবুদ প্রাসাদ প্রস্তুত হয়? কখনই না। সেইরূপ জাতীয় সৌধের উপাদান স্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন উন্নত না হইলে কি জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর? প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের চরমোন্নতি কালে প্রত্যেক ব্যক্তি অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রাণ তেজস্বী ছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টা নগরের প্রত্যেক অধিবাসী দৃঢ়কায় সংযতেন্দ্রিয় মহা পরাক্রমশালী অমিত তেজা বীরপদবাচ্য ছিল। এখনও ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি সুসভ্যদেশে যুবকবৃন্দের দৈহিক উৎকর্ষের প্রতি যথোচিত মনোনিবেশ করা হয়—আমাদের দেশের মত খোদার নৌকা দহে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। আত্ম সংযম, কঠোরতা, ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না পড়িলে ভারতের জাতীয়

সৌধ কখনও মাথা তুলিতে পারিবে কি না ঘোর সন্দেহ স্থল।

ইতঃপূর্ব্বে মাংস, মেদ, মজ্জা সম্বন্ধে অনেক বাক্যব্যয় করিয়াছি। এখন এক বার বাবুদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া প্রাণে ঘা দিয়া দেখি, ফাটা হাঁড়ির মত বেসুরো কি না। এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই আমার পল্লীর কথা মনে হয়। যখন এতগুলো পল্লী চোখের সাম্‌নে তিল তিল করিয়া মরিতেছে, তখন বাঙ্গালীর হৃদয় আছে আর কোন মুখে বলিব? লোকে বলে, বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া এত মেধাবী ও বুদ্ধিমান্। এখন বলিয়া দিবেন কি, বাঙ্গালী কি খাইলে ও কিরূপ শিক্ষা পাইলে হৃদয়বান্ হয়? আমরা যে দিন দিন স্বার্থপর, শুষ্ক প্রাণ ও হৃদয়হীন হইয়া যাইতেছি, ইহার উপায় কি কেহই নির্দ্দেশ করিবেন না? কিরূপ খাদ্য খাইলে আমাদের মজ্জার জোর বাঁধে, এবং হৃদয়ে বল ও সাহস হয় তাহা বলিতে আর বেশী বিলম্ব করিলে চলিবেনা। এমন ধর্ম্মনীতি এখন শিখিতে হইবে—যাহাতে প্রাণে উদারতা ও পরার্থপরতার বিমল উৎস খুলিয়া যায়। পাস করিয়া হাতে ঘড়ি ও নাকে চসমা দিলেই কি দেশের উন্নতি হয়? প্রতি বৎসরই ত কতশত পল্লীবাসী যুবক লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী পাইতেছেন, কিন্তু পল্লীর তাঁহারা কোন উপকারই করিলেন না। পল্লীর জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিল না। তাই বলি, শিক্ষাতে অনেকেই পাইলেন, কিন্তু দেহ সুগঠিত ও তৈয়ারী হইল কয় জনের? এমন শিক্ষা এখন চাই যাহাতে বাঙ্গালীর দেহ ও প্রাণ মজবুদ হয়—শরীরে শক্তি সামর্থ্য হয় এবং হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি-দয়া ও উপচিকীর্ষা জাগিয়া উঠে। বিদ্বান্ ও অর্থবান্ দেশে অনেকেই হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণ ও উচ্চ হৃদয় কয়জন পাইলেন? পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পবিত্র মঙ্গলময় নাম দয়ার সাগর ঈশ্বর চন্দ্রেই সার্থক হইয়াছিল।

প্রাতঃস্মরণীয় দেবতুল্য বিদ্যাসাগর, ভূদেব, গুরুদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উদারচিত্ত ও মনুষ্যত্ব কয়জন পাইলেন? পরের জন্য তাঁহাদের ন্যায় কয়জনের প্রাণ কাঁদিয়াছে? পরের দুঃখে তাঁহাদের মত কাতর হইয়া আর কে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে? দেশ উদ্ধার, জাতীয় উন্নতি—বলিলেই কি হয়? বড় হইবার উপযুক্ত না হইলে কি বড় হওয়া যায়? মাংস, মেদ ও আয়তনে বৃহৎ হইলেই কি বড় হওয়া চলে? Bigness জিনিষটা Greatness নয়। বৃহদায়তন মহত্ত্ব নয়; প্রকাণ্ড শূন্যেরও কোন মূল্য নাই। ত্যাগই উন্নতি ও মহত্ত্বের মূল; বড় হইবার আদি কারণ—বড় মন। যে জাতি কুন্তলগত প্রাণ—অবোধ নারীর ন্যায় কেবল বেশ ভূষার পারিপাট্যে সর্ব্বদা শশব্যস্ত; যে জাতির আরামপ্রিয়তা ও ব্যসন বিলাসিতা মজ্জাগত হইয়াছে, যে জাতির পানে একটু চূর্ণ কম হইলে পৃথিবী রসাতলে যায়, সে জাতি ক্রমশঃ হাল্‌কা হইয়া অবনতি ও ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। দশের ও দেশের উন্নতি চাও, আহার-বিহার বসনভূষণ-বচন প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর সংযম অভ্যাস কর; বিলাসিতা, আরাম স্পৃহা, হালকা আমোদ—রঙ্গরস একবারে বর্জ্জন কর; স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গলতী ছিন্ন কর; পরকে প্রেম ডোরে বাঁধিয়া আপন কর; পরের দুঃখে

ব্যাকুল ও কাতর হইতে শিখ এবং পরের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দাও। ইহাই শিক্ষা, ইহাই দীক্ষা, ইহাই উন্নতির বীজ মন্ত্র। পিতামাতার কাছে ও দুঃখদৈন্যের পাঠশালে পড়িয়া বিদ্যাসাগর এই উচ্চ শিক্ষা পাইয়াই আদর্শ জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অহো! কে আর তেমন করিয়া পরের জন্য কাঁদিবে; আত্মপর ভুলিয়া, সর্ব্বজীবে সমদর্শী হইয়া কে আর পরার্থে সর্ব্ব-স্বত্যাগ করিবে? ওগো বঙ্গজননি। কি দোষে আর তেমন রত্নসম সুসন্তান প্রসব করিতেছনা? তাহার আলোকে কি মা রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হয়? সমুজ্জল চন্দ্র কিরণ আবার কবে দেখিব?

শিক্ষিত সুসভ্য মানব যদি হৃদয়হীন হয়, তবে কাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মন সাধারণ শিক্ষা লাভ করিবে? শিক্ষিত লোক যদি একে একে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান, তবে আর পল্লী সংস্কার কে করিবে? চাষা প য়ের জোরে লাঙ্গল ঠেলিয়া ফসল উৎপাদন করে; কাঠ গোঁয়ার সৈনিক বন্দুক ধরিয়া লড়াই করিতে পারে, কিন্তু কাপ্তেন না থাকিলে কি যুদ্ধ জয় হয়? মাথায় 'চাল' বলিয়া না দিলে কি শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করিতে পারে? শিক্ষিত বাবু সহরে রোজগার করিয়া কি নিজ নিজ পল্লীতে আসিয়া গ্রামের উন্নতি বিধান করিতে পারেন না? তাঁহা-দের যুক্তি আপত্তি—পল্লীতে গেলে মরিয়া যাইব। কেন, সহরে কি মানুষ মরে না? সহরে কি এক মাত্র পাশ করা ছেলে, পিতা মাতাও নবোঢ়া পত্নীর বুকে শেল বিদ্ধ করিয়া সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া যায় না? সহরে কি চোখের সামনে স্বর্ণলতিকা নয়নতারা বিধবা হয় না? কৃত্রিমতাল প্লাবিত ধূমধূলিপূর্ণ কোলাহল আকুলিত সহরের ঠেসাঠেসিতে ফৌজদারী ব্যারাম তো লাগিয়াই আছে, তবে দেওয়ানী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কম। বঙ্গের বাহিরে গিয়া ত হাওয়া খাইতেই হয়। শিমুল তলা, রাচি, ও গিরিডির হাওয়া কি এত মিষ্ট? কেন বঙ্গপল্লীতে কি হাওয়া নাই? জল আছে, হাওয়া আছে, বাঙ্গালীর মোটামুটি খাওয়া পরার সবই আছে। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লীই ভূস্বর্গ ছিল। কি প্রাচুর্য্য, কি স্বাস্থ্য কি নৈতিক বল, কি পবিত্রতা, কি সরলতা, কি আনন্দ, কি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি যে কি সুখশান্তি ছিল—তাহা এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তখনও বনজঙ্গল, পুকুর ডোবা, গর্ত্ত-খাল—বিল সবই ছিল, তবে ছিল না কেবল এই সর্ব্বনাশিনী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী। তাই পল্লীগুলি বনাবৃত হইলেও তপোবন তুল্য শান্তি নিকেতন ছিল। তখন কিছু পয়সা হইলেই লোকে নিজের ভদ্রাসন ফেলিয়া বৎসরে দু' এক সপ্তাহ হাওয়া খাইবার জন্য পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী করিতে অস্থির হইত না। সকলেই সহরে থাকিলেও আপন আপন পল্লীগ্রামের প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিতেন—অন্ততঃ বৎসরে ৺পূজার ছুটীতেও একবার বাড়ী আসিয়া বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, পল্লীর প্রতি বাবুদের আর তেমন টান নাই। শিক্ষিত লোক মাত্রেই

গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া বসবাস করিতেছেন। এমন করিলে কি দেশের উন্নতি হয়? ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর উৎপাতেই তো বঙ্গপল্লী ম্রিয়মাণ। এই তাড়কাকে বধ করিবার জন্ম কি কোন বিশ্বামিত্রই রামলক্ষ্মণ লইয়া আসিবেন না? বিশ্বামিত্রের মহাপ্রাণ, উচ্চহৃদয় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কি কাহারও নাই? এমন কি কেহই নাই, যিনি রাম লক্ষ্মণের ক্ষাত্রতেজোবলে এই বঙ্গ ধ্বংসকারিণী ম্যালেরিয়া সংহার করিতে পারেন? রণে ভঙ্গ দিয়া বঙ্গের বাহিরে পলায়ন করা কি বীরের ধর্ম্ম? পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণের অদম্য অধ্যবসায় ও একতা-বলে কত আধিব্যাধি-প্রপীড়িত প্রাচীন পল্লী-নগর আবার পরম রমণীয় বলবীর্য্যপ্রদ স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছে। আর আমাদের বঙ্গবীরগণ জ্বরের জ্বালায় নিজ নিজ পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া জন্মভূমি বঙ্গমাতাকে চরণে দলিয়া পশ্চিমদিকে ধাবমান! কি অদ্ভূত শোচনীয় পার্থক্য॥ এই আত্মম্ভরি স্বার্থসেবী ভীরু কাপুরুষ পলাতকের ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া দেশ উদ্ধার করা চলে? আমাদের আত্মোদ্ধার যদি না হইল—আমরা যদি ক্রমশঃই বর্ত্তমান সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যময়ী মনোহারিণী ভোগবিলাস-বন্যায় গা ঢালিয়া দিই; আমরা যদি সামান্য একটা পল্লী উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের উচ্চাভিলাষের ভিত্তি কোথায়? এ সংশয় কি একেবারেই অমূলক? বঙ্গপল্লীজাত সহরপ্রিয় বাবুরা একবার স্বার্থ ভুলিয়া, একতা-বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার ও পচা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেখুন, স্বীয় পল্লীর হাওয়া পশ্চিমের হাওয়া অপেক্ষা মধুর কিনা। কত সহৃদয় দানবীর দেশে শিকার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন, একবার বঙ্গপল্লীর বন-জঙ্গল পরিষ্কার ও জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার কল্পে অর্থদানে মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, পল্লী আবার সজীব হইয়া উঠে কিনা। এখনও সময় আছে, পল্লী—ম্যালেরিয়ার সহিত লড়িয়া এখনও গতাসু হয় নাই। কিন্তু প্রাণবায়ু থাকিতে থাকিতে চিকিৎসার দরকার, নতুবা সকল চেষ্টা বিফল হইবে।

দেশের যাঁহারা মাথা—সেই গণ্যমান্য ভদ্রলোকদিগের হৃদয়ই যদি এমন দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অন্যে পরে কা কথা। বাবু-মহলে আজ কাল যখন তখন হার্টফেল। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, হার্ট-ফেল হইয়া অমুক বাবুর মৃত্যু হইল। পাঁচ বছরের ছেলেটা পর্য্যন্ত বলে—আজ অমুকের হার্টফেল হ'ল। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, মাংস-মেদ-মজ্জার উন্নতি হইলেও আমাদের হৃদয়গুলো ক্রমশঃ ক্ষীণ-দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইহার আশু প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়, নতুবা এই সব স্থূলকায় বুদ্ধিজীবী স্মৃতিবীর বঙ্গবাসী দিন দিন অন্তঃ-সারশূন্য হৃদয়হীন আমড়া কাঠের ঢেঁকি হইয়া যাইবে। তবে এ হৃদ্‌ রোগের চিকিৎসা বড় কঠিন—ভারতে হইতে পারে কি না—এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে ডাক্তার-কবিরাজ মহাশয়দিগের একটা বিশেষ স্বাস্থ্যবৈঠক হওয়া আবশ্যক। আমার কিন্তু বিশ্বাস, খুব দামী ঘড়ি যেমন যা'কে তা'কে সারাইতে দেওয়া চলেনা,

সেইরূপ বিলাতপ্রিয় আমাদের বহুমূল্য পৈতৃক হৃদয়গুলো একবার খাস বিলাতে বড়া কোম্পানীর হেড আফিস হইতে মেরামত হইয়া আসিলে আবার দুই একশত বৎসর বেশ চলিতে পারে। Power House বা বিদ্যুৎ আগারে তাড়িত উৎপাদিত হইয়া যেমন সহরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ হৃদয়কেন্দ্রে বলশক্তি উদ্ভূত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আহার-বিহারের প্রতি সত্বর লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রচুর বিশুদ্ধ খাদ্য না খাইলে হৃদয়ে কখনই জোর বাঁধিবে না। এইরূপ স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে থাকিলে পাউয়ার হাউসের কল বিগড়াইয়া কথায় কথায় বাবুদের হার্টফেল হইবে। ফলকথা, আমাদের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্, যকৃৎ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি জীবনীশক্তির উৎসস্বরূপ অত্যাবশ্যক সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির ঝাড়া মেরামত ও অয়েল করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, জাতির এই জীর্ণ সংস্কার বিষয়ে দেশের নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই মনোযোগ দিবেন।

---

# পলাশ।

( কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন )।

পলাশ—হিং ঢাক্ টেসু কেসু। পলাশ বৃক্ষ বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। গোয়ালিয়র অঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত পলাশ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, শাল পত্র দ্বারা যেরূপ ভোজন পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, গোয়ালিয়র অঞ্চলে তদ্রূপ পলাশ পত্র দ্বারা ভোজন পাত্র ব্যবহৃত হয়।

পলাশের শিম্বী চেপ্টা, ইহার ফুল সুদৃশ্য। পৌষের শেষ হইতে পুষ্প দৃষ্ট হয়। পলাশ পুষ্পে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হয়। মাঘ মাসে পলাশের প্রায় পত্রশূন্য হইয়া থাকে, ঐ সময় পুষ্প শোভিত বৃক্ষগুলি দেখিতে অতি মনোরম।

কৃমি রোগে—পলাশ বীজ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

রক্ত পিত্তে পলাশ—পলাশ বল্কলের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া ঐ ঘৃত সেবনে রক্তপিত্ত উর্দ্ধ ও অধো উভয়বিধ রোগে বিশেষ হিতকর।

অতিসারে পলাশ—বিরেচনযোগ্য অতিসারে পলাশ বীজের ক্বাথ দুগ্ধসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। ইহা আমাতিসারেই প্রযোজ্য।

অর্শে পলাশ পত্র—কচি পলাশ পত্র কয়েকটী গ্রহণ করিবে, অতঃপর সমপরিমাণ তিল তৈল ও গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঐ সংগৃহীত পলাশ পত্র ভাজিয়া গো-দুগ্ধজাত

দধির সরের সহিত ভাজ্জিত পত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

রক্তরোধক পলাশ—পলাশ ত্বকের ক্বাথ শীতল করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষু চিনি অথবা মধু সহযোগে প্রত্যহ একবার সেবন করিলে রক্ত বমন ও অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি হয়। ক্বাথের নিয়ম—পলাশ ত্বক ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

রক্ত গুল্মে পলাশ—পলাশের ক্ষারোদক দ্বারা পক্ক ঘৃত—গুল্ম রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অক্ষিরোগে পলাশ—চক্ষুতে ছানি পড়িবার প্রথম সূত্রপাতে ডহরকরঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া উহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঐ বর্ত্তি (ঈষৎ লম্বাকৃতি বটিকা) মধু অথবা ছাগী দুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিয়া নয়নে প্রলেপ দিবে। কবুতরের পালকের দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রলেপ লাগাইবে, ইহাতে চক্ষুর ছানি বিনষ্ট হইবে।

ব্রণে পলাশ—পলাশ পত্র পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করিবে উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বসিয়া যায়।

পলাশ পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রক্তপ্রদরগ্রস্থা নারীর যোনিতে পিচকারী প্রদান করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

মুখ-ক্ষতে এবং কণ্ঠনালীর ক্ষতে ঐ ক্বাথ দ্বারা কবল করিলে ঐ ক্ষতসমূহ আরোগ্য হয়।

ফিতা কৃমি নষ্ট করিতে পলাশ বীজ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে।

মূত্র কৃচ্ছ্রে পলাশ—পলাশ বীজের ক্বাথ ও পলাশ ফুলের ফাণ্ট (পলাশ পুষ্প গরম জলে উত্তমরূপে চটকাইয়া লইলে ফাণ্ট হয়) সেবন করিলে মূত্র কৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে প্রস্রাব সরল হইয়া নির্গত হয়।

পলাশ পুষ্প মূত্রকারক, বস্তিদেশে (নাভির নিম্ন স্থানে) পলাশ পুষ্পের দল পুরু করিয়া বিছাইয়া কদলী পত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকার দর্শে। পলাশ পুষ্প পেষণ করিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলেও মূত্র সরলভাবে নির্গত হয়।

পলাশ পত্রের ক্বাথ অথবা স্বরস শোথ রোগীর ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে পান করিলে উপশম হয়। রক্তপ্রদর, কৃমি ও শূল রোগীর পক্ষে ও ইহা বিশেষ হিতকর।

অতিসারে পলাশ ত্বকের ক্বাথ প্রয়োগ করিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

—•:•:•—

**পরলোক।**—বর্ত্তমান মাসে কলিকাতার তিন জন কবিরাজের পরলোক ঘটিয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জন নেবুতলার সুপ্রসিদ্ধ মহানন্দ গুপ্ত, এক জন হরিনাথ বিশারদ ও অপরের নাম মনোরঞ্জন গুপ্ত। মহানন্দ গুপ্ত মহাশয় ইদানীন্তন কালে বয়োপ্রবীণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হরিনাথ বিশারদ মহাশয় চরকের টীকা রচনায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছিলেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় সবে মাত্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন। আমরা ইঁহাদিগের বিয়োগে ইঁহা-দিগের পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতেছি।

**বিহারে আয়ুর্ব্বেদ।**—বিহারের ভাগল-পুর জেলার সাথুন্দা নামক গ্রামে তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড একটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আমরা ভাগলপুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গালার সকল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণই এরূপ সাধু অনুষ্ঠানে অগ্রসর হউন না।

**ডাক্তারের উদ্ভাবনা।**—"অমৃতবাজার পত্রিকায়" এক জন ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছেন যে, নোনা আতার (Custard apple) পাতার রসে ও পুলটিশে কার্ব্বঙ্কল আরোগ্য হইয়া থাকে। তিনি অনেক রোগীর মধ্যে ইহার ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া-ছেন। নোনাআতা ও সাধারণ আতার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া থাকে। ইহাদিগের রসে ক্ষত আরোগ্য হয়, এ সকল কথা দেশীয় চিকিৎসকেরা বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের মুখে আমাদের দেশের লোক যে পর্য্যন্ত সে কথা না শুনিতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে আস্থা স্থাপন করা চলে কি? দেশীয় চিকিৎসা এই জন্যই ত মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

**ঔষধের অপব্যবহার।**—রসায়ন ও বাজী-করণাধিকারোক্ত শ্রীমদনানন্দ মোদক আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এঔষধ-টির অপব্যবহার কিন্তু এক্ষণে যথেষ্ট ভাবেই দেখিতে পাইতেছি। ঐ মোদকের উপাদান-গুলির মধ্যে সিদ্ধি অন্যতম উপাদান। এই জন্য নেশার উদ্দেশ্যে এই মোদক অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ঔষধে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে, অকারণে তাহার অযথা ব্যবহারে সেই ঔষধে সেই ব্যাধির উৎ-পত্তিও হইতে পারে। সামান্য সর্দ্দি কাসিতে যদি যক্ষ্মা অধিকারের ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র সর্দ্দি কাসির উপশম হইয়া থাকে কিন্তু ভবি-ষ্যতে তাহারই ফলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে

হয়। সিদ্ধি ঘটিত মোদকও সুস্থ শরীরে সেবনের ফল তদ্রূপ। কলিকাতায় পানের দোকানে, মণিহারি দোকানে এই সিদ্ধি ঘটিত মদনানন্দ মোদকের কিন্তু অবাধ বিক্রয় চলিতেছে। গ্রে ষ্ট্রিট, বিডন ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানের মোড়ে মোড়েও কোন কোনও কবিরাজ নামধারীর ফেরিওয়ালাগণও "চাই মদনানন্দ মোদক" বলিয়া উহার বিক্রয় অপ্রতিহত গতিতে চালাইতেছে। এরূপ প্রচারাধিক্যে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের যে কত দূর অনিষ্ট করা হইতেছে—তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন। সিদ্ধিঘটিত মোদক বিক্রয়ের জন্য আবগারি বিভাগ হইতে যে লাইসেন্স লইতে হয়, তাহাতে কেবল রোগীদিগকে উহা বিক্রয় করিবারই অনুমতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এরূপভাবে রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার সাহায্যে এবং পানের দোকানে, মণিহারি দোকানে ইহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা আবগারি-আইনের কথনই উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, কলিকাতার মত সহরেও আবগারি বিভাগ এ বিষয়ে লক্ষ্যহীন। সাধারণের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

---

# সমালোচনা।

—:o:—

বৈদিক ভারত।—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট প্রণীত। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র বি-এ সম্পাদিত। এই পুস্তকের সকল গল্পই বেদ অবলম্বনে লিখিত। সুকুমার মতি শিশু-হৃদয়ে এই পুস্তকের গল্প গুলি অঙ্কিত হইলে দেশে ধর্ম্মের স্রোত যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা ইংলণ্ডের কুলজী মুখস্থ করিতে পারি, কিন্তু আপনার দেশের আত্ম-পরিচয় জানিনা ইহা কম দুঃখের কথা নহে। রায় বাহাদুরের এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাহাই। গল্পগুলি অতি সহজ ভাষায় লিখিত, এজন্য বড়ই সরস হইয়াছে; এই বৈদিক ভারত প্রত্যেক ছাত্রের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাদিগের কোমল প্রাণে ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুর করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য—আমরা রায় বাহাদুরের এই পুস্তকখানি পাইয়া অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। এখনকার যুগে দীনেশ বাবুকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাট বলা যাইতে পারে। তিনি এই ধরণের গ্রন্থ প্রণয়নে শিশু সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ } মাঘ, ১৩২৯ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

# ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ।

[ শ্রী—পাইকর, বীরভূম ]

ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এবার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের মনে হয় ম্যালেরিয়া রোগ উপস্থিত হইলে আমাদের শরীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝা যায়, যে, আমাদের দেহস্থ স্বাভাবিক তাপ—দেহ প্রবিষ্ট পদার্থ সমূহকে পরিপাক করে এবং এই পাচিত পদার্থের সারাংশ দেহের উপযোগী বলিয়া দেহ পুষ্টির জন্য তাহা পরিগৃহীত ও অপরাংশ অনুপযোগী বলিয়া মলরূপে পরিত্যক্ত হইতেছে। এইরূপ পাকক্রিয়া যতদিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় ততদিন আমরা শরীরের মধ্যে কোনরূপ গ্লানি বুঝিতে পারি না, কিন্তু এই পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই শারীরযন্ত্রগুলি যেন নিজ নিজ ক্রিয়া সাধনে এক প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে আমাদের শরীর "ম্যাজ ম্যাজ" করিতে থাকে।

আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আলোচ্য পাকক্রিয়ার সময় দেহস্থ অগ্নি ও দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ এতদুভয়ের মধ্যে একরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সংগ্রামে অগ্নির জয় হইলে দেহমধ্যে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির আধিক্য ও প্রকৃতি বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে অগ্নি পরাজিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে এই সকল পদার্থের পরিপাক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হয় না। কাজেই তখন দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর সারাংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া শরীর পোষণে নিয়োজিত হইতে পারে না। উপরন্তু উহা অসারাংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের উপাদানের মধ্যে একরূপ বিভ্রাট উপস্থিত করে। বলা বাহুল্য,

এই বিভ্রাটই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যাবস্থা ঘটাইবার প্রধান কারণ। যতদিন দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর যথারীতি পরিপাক ক্রিয়া সমাপিত হইতে থাকে, ততদিন দৈহিক উপাদানের শাসক বায়ু, পিত্ত ও কফ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া সাম্যাবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হই-লেই দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির অসারাংশ—সারাংশের সহিত মিলিত হইয়া বায়ু, পিত্ত ও কফের ক্রিয়াশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাহার ফলে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীর মধ্যে কোন একটী, অথবা দুইটী কিম্বা তিন-টীই কুপিত হইয়া পড়ে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেহস্থ তাপ স্বভাব বশেই দেহের মধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থকে শাসন করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ অবস্থায় আনয়ন করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেও এই অগ্নি যে তাহাদিগকে শাসন করিয়া তাহাদিগের নিজ নিজ অবস্থায় আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাঠক আরও অবগত আছেন যে, এই পাকাগ্নির শক্তি অসাধারণ। স্বভাবতঃ ইহার তাপের মাত্রা ৯৮৷৷০ রেখা হইলেও নরদেহে ইহা কারণ বিশেষে ১১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ যখন সামান্ত মাত্রায় দূষিত হয়, তখন আমাদের দেহের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়াও তাহাদিগের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। আমা-দের শরীর যখন সামান্ত রূপ ভার বোধ হয়, তখন উক্ত ত্রিদোষের প্রকোপ সামান্তরূপ হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হয় এবং তখন একটু সাবধান হইলেই অর্থাৎ ২।১ বেলা উপবাস বা লঘু আহার করিলেই আমাদের দেহস্থ অগ্নি তাহার শোধন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কেহ সতর্ক না হইয়া পূর্ণ আহার বা অন্যরূপ অত্যাচার করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার ফলে বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং পাচকাগ্নি সেই দোষের ফলে ক্ষীণবল হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অগ্নি—দোষের প্রাদুর্ভাবে ক্ষীণবল হইলেও একেবারে পরাভূত হয় না। পরন্তু এই অগ্নি যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দোষের মাত্রানুসারে প্রবলতর হইয়া দোষকে দগ্ধ করতঃ তাহার শোধন করিতে ক্ষান্ত থাকে না।

যখন এইরূপ তাপ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ যখন আমাদের জ্বর হয়—তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের দেহস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে কোন একটী, অথবা ২টী অথবা তিনটীর দোষ উপস্থিত হইয়াছে এবং দেহাগ্নি কুপিত দোষকে পরিপাক করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। কোন্ দোষের প্রকোপ হইয়া যে জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নাড়ী পরীক্ষা করিলেই অনায়াসে বুঝা যায়। ডাক্তার বাবুরা এইরূপ নাড়ী পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকার না করিলেও আমাদের ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এইরূপ নাড়ী পরীক্ষা বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের প্রকৃত কবিরাজগণ এই মতেরই সমর্থক।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ত্রিদোষের সহিত দেহস্থ অগ্নির যে

মল্লযুদ্ধ বাধে অবস্থা বিশেষে তাহারই নাম জ্বর। এই যুদ্ধে অগ্নি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ৯৮॥০ রেখায় থাকিয়া দোষকে সংশোধন করিয়া লইতেছে তখন আর তাহা জ্বর বলিয়া কথিত হয় না, কিন্তু দোষের গুরুত্ব নিবন্ধন অগ্নির যেমন ৯৯, ১০০, ১০১ ডিগ্রি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী তত ডিগ্রির (রেখার) জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি।

যাহা হউক এখন কথা এই যে, বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ ও দেহস্থ অগ্নি এতদুভয়ের মধ্যে যে মল্ল যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহারই নাম যে জ্বর তাহা বেশ বুঝা গেল। এই মল্লযুদ্ধ কিছুদিন পরে থামিয়া গেলেই তাহা তরুণজ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনেক-সময় দেখা যায় যে, এই মল্লযুদ্ধ যেন লাগিয়াই আছে। দেহের অগ্নি সকল সময় স্বাভাবিক রেখা অতিক্রম করে না বটে কিন্তু তখনও দোষের সহিত তাহার সংঘর্ষ বন্ধ হয় না। এই অবস্থা থাকিতে থাকিতে এক সময় হঠাৎ অগ্নির রেখা বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ফলতঃ কোনক্রমেই উভয়ের মল্লযুদ্ধ বন্ধ হয় না। দোষের সহিত অগ্নির যে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী মল্লযুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহাকেই বিষম-জ্বর নামে অভিহিত করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহারই ইংরাজি নাম ম্যালেরিয়া।

এই ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বর নানাবিধ। শারীরাগ্নির সহিত যে ত্রিদোষের এইরূপ মল্লযুদ্ধ হয়, সেই দোষের প্রকৃতি অনুসারে বিষমজ্বর নানাপ্রকার। তবে সাধারণতঃ এই মল্লযুদ্ধ ত্রিবিধ। একপ্রকার মল্লযুদ্ধের সময় শারীরাগ্নির তাপ স্বাভাবিক রেখায় (Normal Temperature) থাকিয়া দোষত্রয়কে পরিপাক করিতে থাকে। এমত অবস্থায় শরীর ভার থাকিয়া রোগের অনুভূতি হয় মাত্র। কিন্তু গাত্রের তাপ বৃদ্ধি হয় না। কাজেই জ্বর হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। এই সময় সতর্ক হইয়া দোষের ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিলে দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শারীরাগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে দুর্ব্বল দোষ গুলিকে পরিপাক করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় অবস্থায় দোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শারী-রাগ্নি আর স্বাভাবিক অবস্থায় তৎসমুদয়কে পরিপাক করিতে পারেনা। তখন দেখা যায়, শারীরাগ্নি নিজের তাপের রেখা বৃদ্ধি করে এবং হুতাশন মূর্ত্তিতে দোষগুলিকে দগ্ধ করিবার জন্য মল্লযোদ্ধার ন্যায় তাহাদের উপর আধি-পত্য বিস্তার করে। এই সময় গাত্রতাপ ১০৭৷১০৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এই-রূপে দোষগুলি কথঞ্চিৎ দগ্ধ হইলেই শারীরাগ্নি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া দোষগুলিকে পরিপাক করিতে থাকে। তৃতীয় অবস্থায় শারীরাগ্নি স্বাভাবিক অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চতর রেখায় অহরহঃ দোষ-গুলিকে দগ্ধ করে এবং যতদিন না দোষ সমূলে বিনষ্ট হয়, ততদিন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করেনা। বলা বাহুল্য এই তিন অবস্থাতেই রোগী রোগের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারে। তবে ইহা ঠিক যে, রোগী ১ম অবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয়াবস্থায়, এবং দ্বিতীয়বস্থা অপেক্ষা তৃতীয়াবস্থায় রোগ-জনিত যন্ত্রণার অধিকতর অনুভূতি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, যাহা তাহাতে বুঝা

যায় যে, শারীরাগ্নি ও দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির মধ্যে সততই একরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে শারীরাগ্নি যতদিন বিজয়ী থাকে অর্থাৎ যতদিন দেহপ্রবিষ্ট পদার্থগুলিকে নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিয়া তাহা হইতে দেহের উপযোগী সারাংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে, ততদিন দেহের মধ্যে আমরা কোনরূপ গ্লানি অনুভব করিনা। কিন্তু যখন শরীর প্রবিষ্ট পদার্থের মাত্রাধিক্য ঘটে অথবা ঈদৃশ পদার্থ বিস্তৃত হইয়া শরীরে স্থান প্রাপ্ত হয়, তখন দেহাগ্নি আর স্বচ্ছন্দে নিজ ক্রিয়া সাধন করিতে সক্ষম হয় না। বলা বাহুল্য, তখনই আমরা শারীরিক গ্লানি উপলব্ধি করিয়া থাকি।

এক্ষণে এই দেহাগ্নি কিরূপ পদার্থ এবং কিরূপেই তাহার শক্তি ক্রিয়াশীলা অথবা ক্ষীণক্রিয়া হয় এইবার তাহাই আলোচ্য। অধ্যাত্ম শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, আমাদের প্রাণই অগ্নিস্বরূপ। এই অগ্নি—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হইয়া একই শক্তির পঞ্চ ধারার ন্যায় সর্ব্বশরীর ব্যাপক হয় এবং তাহার ফলে শরীরগত বস্তুর পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক অণুপরমাণু যথাবশ্যক ভাবে উষ্ণ থাকিয়া অবিকৃত থাকে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে এই প্রাণাগ্নি ও দেহ প্রবিষ্ট পদার্থ নিচয় এতদুভয়েরই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রাণ যে অগ্নিস্বরূপ তাহা ব্রাহ্মণমাত্রেই অবগত আছেন। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে প্রাণকে পুনঃপুনঃ অগ্নিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। সৎগুরু মাত্রেই উপদেশ দিয়া থাকেন যে, এই অগ্নির শক্তি ও ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সন্ধ্যা, উপাসনা, ধ্যান ধারণা, প্রাণায়াম, ইত্যাদির অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক; কারণ ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত ধ্রুব সত্য। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন লোক প্রবল প্রাণসংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সান্ধ্যাহ্নিক না করিয়াও সুস্থ থাকিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের প্রাণসংস্কার দুর্ব্বল, তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলে রুগ্নই থাকিয়া যান। কারণ তাঁহাদের প্রাণাগ্নি দুর্ব্বল বলিয়া দেহ প্রবিষ্ট পদার্থের পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অনেকেই এই গূঢ়তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন। ফলে দেখা যায়, যাঁহাদের প্রাণসংস্কার দুর্ব্বল, তাঁহারা প্রবল প্রাণসংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে গিয়া নানারূপ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন। রামবাবু সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন না, কদাচার করিতেও ক্ষান্ত নহেন, পানাহারেও মিতাচারী থাকেন না, অথচ তাঁহার শরীর সবল ও সুস্থ। কিন্তু শ্যামবাবু এইরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিতে না করিতেই পীড়িত হন। এরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞান ব্যক্তিগণ কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কারণ, তাঁহারা অজ্ঞানান্ধ বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারেন না যে, রামবাবু ও শ্যাবাবুর প্রাণসংস্কারের বিশেষ তারতম্যই উল্লিখিতরূপ বৈচিত্র্যের অবিসম্বাদী কারণ।

যাহা হউক, এ সব অধ্যাত্ম বিস্তার কথা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক

বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। তবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই অধ্যাত্ম তত্ত্বের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্থূল জগতের যে বিচার করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই ২।১ কথা বলা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদের মতে এই দেহাগ্নির নাম পাচকাগ্নি, রঞ্জকাগ্নি, সাধকাগ্নি, আলোচকাগ্নি ও ভ্রাজকাগ্নি। এই দেহাগ্নিকে সবল ও ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে এই পঞ্চাগ্নির ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলেই দেহাগ্নি দেহের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবে। এবং তৎসমুদয় তখন যথাবশ্যকভাবে উষ্ণ রাখিবে এস্থলে প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, অন্নব্যঞ্জনাদি খাদ্য বস্তুর উষ্ণতার হ্রাস ও শৈত্যের বৃদ্ধি অনুসারে তৎসমুদয় যেমন বিকৃত হইয়া উঠে, তদ্রূপ প্রাণাগ্নির তাপে বঞ্চিত হইলে আমাদের দেহও বিকৃত ও বিবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া পরে।

অতঃপর আমাদের দেহ প্রবিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। এই দেহপ্রবিষ্ট বস্তু স্থূলতঃ দ্বিবিধ। ১ম, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নপান। ইহা আমাদের মুখ গহ্বর দিয়া প্রবিষ্ট হয়। ২য়, বাহ্য প্রকৃতি অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, তেজ, আকাশ ও বায়ু। এই পঞ্চবিধ স্থূলভূত অহরহঃ আমাদের দেহের আহার বা আহৃত পদার্থ। আমাদের জন্মলব্ধ সংস্কার খাদ্য-পানীয়ের ন্যায় সতত এই এই পঞ্চ স্থূলভূত পদার্থকেও দেহ সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। অতএব এই অন্নপান ও পঞ্চস্থূলভূত যে পরিমাণে খাঁটি হইবে, আমাদের দেহাগ্নি নিজ সংস্কার বশেই সেই পরিমাণে নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। আর যে পরিমাণে তাহারা দূষিত হইবে, সেই পরিমাণে এই অগ্নি নিজ ক্রিয়া সাধনে বাধা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার ফলে দেহ গঠনের মুখ্য উপাদান রসাদি সপ্তধাতু ও বায়ু, পিত্ত এবং কফ নামক দোষধাতু দূষিত হইবে। এই দশটী পদার্থ লইয়াই যখন দেহ, তখন তাহার সমস্তগুলি অথবা কতকগুলি দূষিত হইলে যে দেহের অসুস্থতা আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

দেহাগ্নি খাদ্য, পানীয় ও আহৃত পঞ্চভূত হইতেই রস এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক দোষ ধাতু প্রস্তুত করে। আবার রস হইতে যখন রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রস্তুত হইতেছে, তখন রস দূষিত হইলে সকল গুলিই যে দূষিত হইবে তাহাতে আর মতভেদ থাকিতে পারে না। এইরূপে ঐ সকল ভুক্ত পীত ও আহৃত বস্তুই যখন বায়ু, পিত্ত ও কফের জনক, তখন তাহাদের বিকৃতিতে এই দোষ ধাতু ত্রয়ের বিকৃতি হওয়াও সাম্ভব্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমস্ত খাদ্য ও পানীয় বস্তুর আলোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে আমরা কেবল ২।১ টীর দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। শরীর নির্ম্মাণার্থ যে সকল উপাদান আবশ্যক তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই যে জল তাহা আমরা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। কি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, কি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ, কি এলোপ্যাথিক শাস্ত্র, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এতৎ পরিমাণ জলের অত্যাবশ্যকতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন

কিন্তু আজকাল এদেশের লোক কিরূপ জল ব্যবহার করিতেছেন তাহাই আলোচ্য। সুশ্রুত বলেন,—

কীটমূত্র পূরীষাণ্ড শবকোথপ্রদূষিতং
তৃণপর্ণোৎকর যুতং কলুষং বিষসংযুতং
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেৎ বাপি নবং জলং
স বাহ্যাভ্যন্তরান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবতু।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কীট, মূত্র, পূরীষ, শব অথবা বিষ কর্ত্তৃক দূষিত কিম্বা তৃণপত্র প্রভৃতি দ্বারা কলঙ্কিত জলে অবগাহন বা সেই জল পান করে অথবা যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নূতন জল অবগাহনার্থে ব্যবহার করে, তাহার বাহ্যিক ও আন্তরিক নানাবিধ রোগ জন্মে।

পল্লীবাসী জনসাধারণ ও পল্লীর অবস্থাভিজ্ঞ চৈতন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, পল্লীমাত্রেই ঐরূপ জল ব্যতীত অন্যরূপ জল পাওয়া যায় না। কারণ পল্লীবাসিগণ পুষ্করিণীর জলে মূত্র ও তাহার তীরে মলত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে না। একে তো পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীগুলির সংস্কার হয়না অথবা তথায় আর নূতন পুষ্করিণী খনন করা হয় না, তাহার উপর এতাদৃশ পশুবৎ অত্যাচার! অজ্ঞান গবাদি জন্তু যেমন গোশালায় মলমূত্র ত্যাগ করে, পশু প্রভৃতি অনেক পল্লিবাসী নিজ নিজ স্বাস্থ্যের আধার স্থানগুলি তদ্রূপ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দূষিত করে। মলমূত্রাদি শরীরের অনুপযোগী বলিয়া প্রাণক্রিয়ার ফলে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু পল্লীবাসীগণ এমনই দুর্ভাগা যে, পুনরায় তাহারা তৎসমুদয়কে জলের সহিত দেহপ্রবিষ্ট করিয়া থাকে।

এই তো গেল জলের কথা। এখন শরীর রক্ষা ও পোষণের অন্যতম প্রধান উপাদান বায়ুর বিষয় আলোচ্য। জলমধ্যে যেমন জল জন্তুর বাস, স্থলচর জন্তুগণ তদ্রূপ বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষা করে। বায়ু মধ্যস্থ অম্লজান প্রাণাগ্নির প্রধানতম ইন্ধন বিশেষ। সেই জন্য ক্ষীণশ্বাস রোগীদিগকে অম্লজান শুঁকাই বার ব্যবস্থা করা হয়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত অথবা অন্য কোন রোগে দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ এই জন্য মৃদুমধুর প্রাতঃসমীরণ সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। উষাকালে পুষ্প চয়নাদি করিলেও অধিক মাত্রায় অম্লাজন বায়ু ফুসফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিকে প্রবলতর করিতে সক্ষম হয়।

পাঠক অবগত আছেন যে, পল্লীমাত্রেই পয়ঃনালীর ( Drainge ) সুবন্দোবস্ত নাই, কাজেই গ্রামের মধ্যস্থ খাল—ডোবায় জল জমে এবং তাহার ফলে তৃণ পত্রাদি পচিয়া বায়ু দূষিত করে। পল্লীবাসিগণ নিজনিজ বাটীর নিকটে "সারগড়" রাখে এবং তন্মধ্যে গলিত খড়, গোময় ও গো-মূত্রাদি বায়ুকে বিষাক্ত করে। এতদ্ব্যতীত প্রতিগ্রামের অধিকাংশ পুষ্করিণী ও গর্ত্তে দূষিত জল পূর্ণ বলিয়া তৎসমুদয় হইতেও বিষাক্ত বায়ু উত্থিত হয়। এইরূপ নানারূপ অত্যাচারের ফলে মৃত্তিকা হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা দূষিত হইয়া পল্লী বাসীর দেহে শুষিয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই ভূবাষ্পের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক

বাড়ীর মল মূত্রাগার ধৌত দূষিত জলই পুষ্করিণীর জল সরবরাহ কার্য্যে সহায়তা করে। যে সমস্ত পল্লীতে এইরূপ ত্রুটী বিদ্যমান, তৎসমুদয়ের বায়ুই দূষিত। সুতরাং ঈদৃশ বায়ু সেবন করিলে ফুসফুসে অম্লজান প্রবেশ না করিয়া কেবল অঙ্গারজান প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অপকারই করিয়া থাকে।

দেহের জন্য যে সকল বস্তু আহৃত হয়, তন্মধ্যে জল ও বায়ু প্রধান হইলেও ঘৃত,তৈল, মৎস্য, মাংস, তণ্ডুলাদি বস্তুও কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখন লোকে ঘৃতের নামে প্রায় শৃগাল কুক্কুরাদি ও গলিত শবদেহ হইতে নিঃসৃত চর্ব্বি ভোজন করে। খনিজ জলীয় পদার্থ মিশ্রিত তৈল, বিষাক্ত জলের মৎস্য প্রভৃতিও বিশেষ অনিষ্টকর। উল্লিখিত দূষিত খাদ্য ও আহার্য্যবস্তু পাকস্থলী নিহিত হইলে তাহা হইতে যে রস প্রস্তুত হয় তাহাও দূষিত পদার্থ। এইরূপ তৎসমুদয় হইতে দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফের ক্ষয়পুরণার্থ যে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্মে,তাহাও দূষিত। সুতরাং এই সকল দূষিত বায়ু পিত্তাদি দেহস্থ বায়ু পিত্তাদির ক্ষয়পূরণ করিবে কি—তাহাদিগকে বিকৃত ও কুপিতই করিয়া থাকে। দেহাগ্নি যতই কেন পরিপাক ক্রিয়া সক্ষম হউক না, তাহার মুখে নিয়তকাল এইরূপ সংস্কার বিরুদ্ধ পদার্থরাশি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাহা আর কতকাল পাকক্রিয়ায় সক্ষম থাকিবে? ফলে এই অগ্নি অচিরকাল মধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেহস্থ দূষিত রসাদি ৭টী ধাতু এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষধাতু মোট এই ১০টী বা তাহাদের কয়েকটীর সহিত দেহাগ্নির সংগ্রামই জ্বরের বীজাবস্থা। এই সংগ্রামের সময় মিথ্যাহার, অথবা বিহার, অথবা ঋতুবিপর্য্যয় নিবন্ধন দূষিত ধাতুর বলাধিক্য ঘটিলেই দেহাগ্নি নিজ রেখা ( Degree ) চড়াইয়া ফেলে এবং তাহার ফলে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপ ( Normal-temperature ) উচ্চতর রেখায় ( High Temperaturre ) এ উপনীত হয়। বলা বাহুল্য, এই জন্যই শুধু ম্যালেরিয়ার রোগী কেন, যে কোন রোগীরই বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা উচিত।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, জ্বর ছাড়াইতে হইলে যাহাতে আমাদের দেহে দোষের মাত্রা কমিয়া আসে তৎপ্রতিই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ডাক্তার বাবুরা কুইনাইন প্রয়োগ এবং কবিরাজগণ হরিতাল ভস্ম ও পাচন প্রভৃতি কষায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অগ্নির ক্রিয়া অস্বাভাবিকভাবে সংযত করিয়া থাকেন। ফলে দেখা যায়, ইহাতে দোষের বৃদ্ধি ও অগ্নির ক্ষয় হইয়া থাকে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত দোষের মাত্রাধিক্য ঘটিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রোগীর অরুচি হইলে অখাদ্য বস্তু তাহার মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ কুইনাইন, হরিতাল ভস্ম প্রভৃতি অগ্নিনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দেহাগ্নির হ্রাস হইলে প্রথম প্রথম দেখিতে ও শুনিতে তৃপ্তিপ্রদ হয় বটে,কিন্তু তাহার পরিণাম অতি ভীষণ। কারণ, শারীরাগ্নিকে কমাইবার জন্য এইরূপ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াবলম্বন করিলে দেহের মধ্যে দোষরাশি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে এবং তাহা বিবিধ রোগবীজাণুর ক্ষেত্রস্বরূপ